প্রবাস বন্ধু

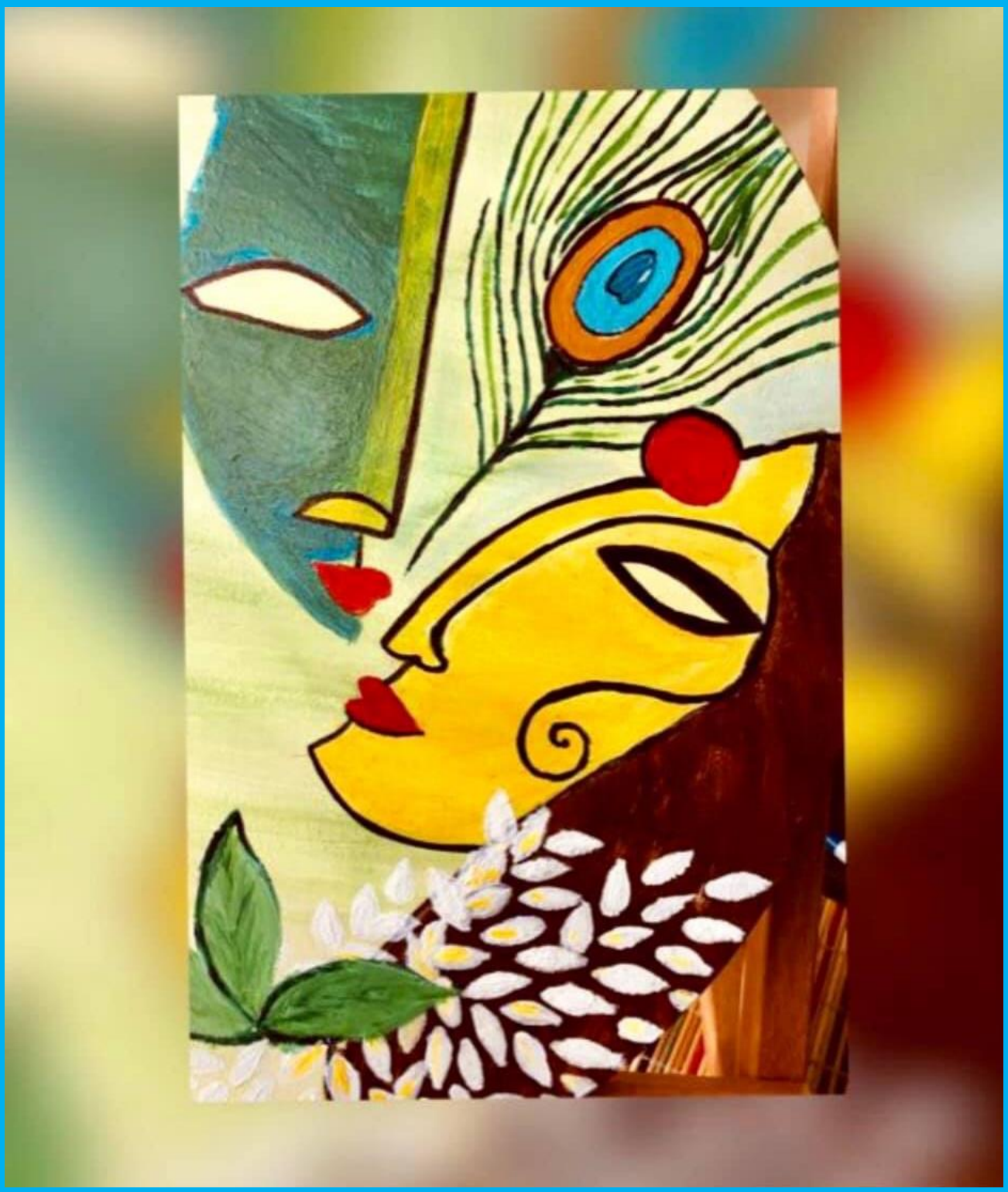

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৭

১৪২৭ : প্রবাস বন্ধু : সূচিপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2020

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	2
গদ্য		
বাংলা ভাষা আন্দোলনের তিন অধ্যায়	সোমনাথ বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	3
বিষ্ণুপুরের গল্পকথা	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	6
দুটি ভাল অভিজ্ঞতার কথা	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	13
বিশ্বায়ন	ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	15
পত্নীগৃহে যাত্রা	শুভা আঢ্য (অস্টিন, টেক্সাস)	22
অদৃশ্য	জয়া চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	41
করোনার কড়চা	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	42
ঠিক তোর মতন...	অর্চিষ্মান বাগচী (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	46
সিম্ফনি	দেবব্রত তরফদার (কলকাতা, ভারত)	49
থেরাপি	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	52
অন্তরে বাহিরে	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	54
রোজগার	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	58
একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রেমকাহিনী	ডলি ব্যানার্জী (কলকাতা, ভারত)	61
কবিতা		
পিতা ও কন্যা, স্মৃতি অবিনশ্বর, গেদু মিঞার বউ	শেলী শাহাবুদ্দিন (মাউন্টেন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া)	25, 36, 40
কথা প্রেম ক্লান্তি, স্বপ্ন, ভালবাসা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	25, 35, 39
ডারউইন	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	26
অকিঞ্চিৎ, কতটুকু	অর্চিষ্মান বাগচী (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	26, 32
করোনামঙ্গল	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	27
মনসংগীত ১, মনসংগীত ২, দ্বিমন	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	28, 36, 38
ভালবাসার দিন	কমলপ্রিয়া রায় (অগাস্টা, জর্জিয়া)	28
মহাদৈত্য করোনা, একুশের ডাক, সরল অতীত	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	29, 35, 39
লাভ ইউ জিন্দেগী, ফিরে দেখা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	30, 37
আমাকে ভেঙেছ বিনষ্টিতে	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	31
তুমি এসো তুমি এসো	শ্রী সদ্যজাত (কলকাতা, ভারত)	31
দাগ	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	32
প্রবাহ জীবন	সুব্রত ভট্টাচার্য্য (কলকাতা, ভারত)	33
প্রবাস	দেব বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যান্ আরবার, মিশিগান)	34
কবিতা	অমিতাভ মিত্র (কলকাতা, ভারত)	34

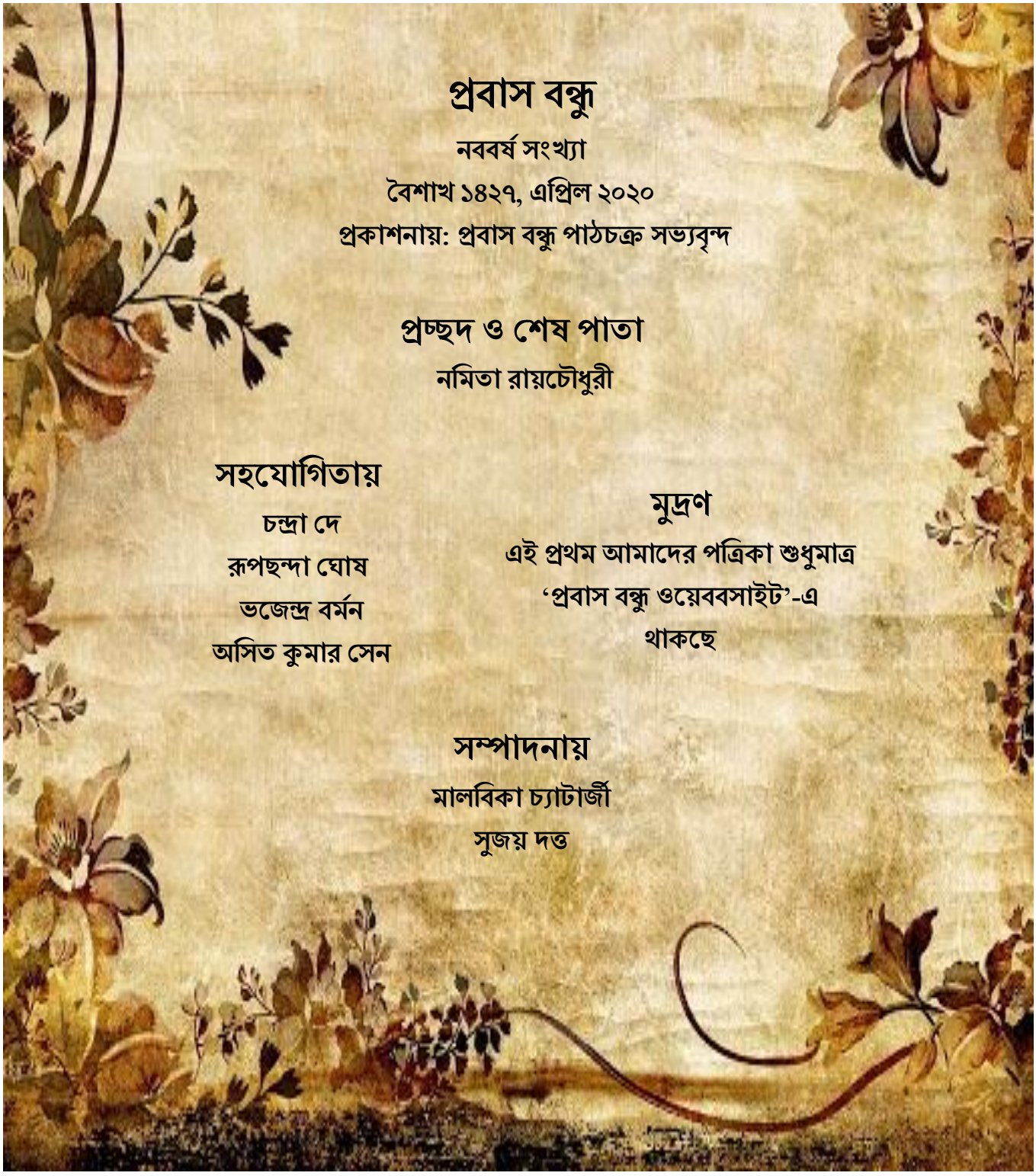
প্রবাস বন্ধু
নববর্ষ সংখ্যা
বৈশাখ ১৪২৭, এপ্রিল ২০২০
প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ
প্রচ্ছদ ও শেষ পাতা
নমিতা রায়চৌধুরী
সহযোগিতায়
চন্দ্রা দে
রূপছন্দা ঘোষ
ভজেন্দ্র বর্মন
অসিত কুমার সেন
মুদ্রণ
এই প্রথম আমাদের পত্রিকা শুধুমাত্র
‘প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইট’-এ
থাকছে
সম্পাদনায়
মালবিকা চ্যাটার্জী
সুজয় দত্ত

সম্পাদকীয়

এসে গেল ১৪২৭ সাল| কিন্তু সমারোহে আসতে পারল না| অন্যান্য বছরের মতো সারা কলকাতা শহরের হাটেবাটে গাঁদাফুলের মালায় ঝকঝক করে উঠতে পারল না সবকটা দোকান ঘরের দরজাগুলো| ব্যবসায়ীরা পয়লা বৈশাখে হালখাতা খুলে বছরের প্রথম হিসেব লিখতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলেন| 'করোনা' সারা পৃথিবীকে থমকে দিলেও প্রকৃতির নিয়মে নতুন বছর এসে গেল| এই বিপদের দিনে নাই বা হ'ল উৎসব| করোনার মহামারীতে আতঙ্কিত জনতা বাড়িতে বসে যতটুকু নতুন বছরকে আহ্বান জানাবার আয়োজন করতে পারে ততটুকুই করল| বিপদ কাটিয়ে উঠলে আমরা ফিরে তাকাব স্মৃতির ঘরে, ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বিশ্বব্যাপী এই দুর্যোগের সময়|

আমরা, যেসব বাঙালিরা বিদেশে থাকি তাদের কাছেও নববর্ষ একটা বিশেষ উৎসবের দিন| হিউস্টন দুর্গাবাড়িতে তো অবশ্যই এই দিনের জাঁকজমকের বৈশিষ্ট্য আছে| হিউস্টন দুর্গাবাড়ির প্রাঙ্গণ পয়লা বৈশাখে আনন্দ-কোলাহল-মুখর হয়ে উঠতে পারল না| এই বছরে সবই স্তব্ধ! আমরা সবিস্ময়ে দিনের পর দিন দেখছি কেমন ঝড়ের গতিতে বেড়ে চলেছে করোনার প্রকোপ| বিপুল ঝড় যখন আসে, সে চলেও যায় বেশ খানিক তছনছ করে, এক্ষেত্রে আমরা দেখছি একসঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে এই বীভৎস ভাইরাসের ঝড় প্রতিনিয়ত প্রলয়ঙ্কারী ধ্বংসের তান্ডব লীলা চালিয়ে চলেছে|
আমাদের জীবন বাড়িবন্দী| কেবল "খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার" এই আমাদের পৃথিবী!

কিন্তু এতসব নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে কি আমরা বারবার নতুন শিক্ষার আভাস পাচ্ছি না?
আমরা বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম; আমাদের চারপাশের ভূমণ্ডলটুকু একটু চোখ মেলে দেখার অবকাশ হারিয়ে যাচ্ছিল| আমাদের এই ব্যস্ততায় আমরা কেবলই দূষিত করে তুলছিলাম আমাদের পরিচিত জগৎটাকে| বর্তমানে এই থমকে যাওয়া পৃথিবীতে আবার ফিরে আসছে দূষণমুক্ত প্রকৃতি| যেসব জায়গায় পল্যুশন ঝাপসা করে রেখেছিল চারপাশ, যানজট আর অতিরিক্ত শব্দের প্রাচুর্যে দম আটকে আসত, সেসব জায়গায় দেখা যাচ্ছে পল্যুশনের মাত্রা অনেক কমে গেছে| আমরা নিজেদের বড় বেশী শক্তিশালী মনে করছিলাম| সেই সব শক্তি, ধন, অহংকার, হানাহানি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে প্রবল এক শক্তি বুঝিয়ে দিল মানব শক্তিরও উপরে তার অধিষ্ঠান|

আমরা সদা সর্বদা বাড়িতে থেকে আত্মীয়, বন্ধুদের সঙ্গ পাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠছি| কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলতে, মানুষকে একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে| অথচ এই কিছু মাস আগে অবধি আমরা মানুষজনের কাছে থেকেও কত দূরে ছিলাম! শুধু সেলফোন আর ট্যাবলেট আঁকড়ে কাছের মানুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলা, তাদের হাতে হাত রেখে সমবেদনা বা সমসুখ ভাগ করে নিতে কি আমরা গাফিলতি করিনি? বর্তমান পরিস্থিতিতে বাড়িতে বসে আত্ম অনুসন্ধান করে যদি আমরা এতটুকুও শিখি যে আমাদের জীবনে একটু সচেতনতা জাগা উচিত – বহু মানুষের জীবনের বিনিময়ে এই দুর্যোগের সময় সেটাই একটা সুফল হিসাবে দেখা যেতে পারে|

করোনার কারণে নববর্ষ সংখ্যা ছাপানোর অক্ষমতায় এইবারের সংখ্যা কেবলমাত্র "প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট"-এ থাকবে| এছাড়া আমি সব অংশগ্রহণকারীদের কাছে পত্রিকার পিডিএফ ফাইলও পাঠিয়ে দেব| ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের এই অযাচিত অপারগতার জন্য|

সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন| এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায়ও যাঁরা পত্রিকার কথা চিন্তা করে লেখা জমা দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি| সবার জন্য শুভ কামনা করি|
মালবিকা চ্যাটার্জী

বাংলা ভাষা আন্দোলনের তিন অধ্যায়

সোমনাথ বসু

কথায় বলে, তাকে তুমি দেশছাড়া করতে পারো কিন্তু তার থেকে দেশকে তুমি ছাড়াতে পারবে না | আসলে দেশ তো কোনো প্রাণহীন ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড নয়, দেশ একটা বুকজোড়া ভালবাসা | এই ভালবাসার নামই মাটি, সংস্কৃতি ও শিকড় | শিকড়ের মৃন্ময় রূপকে বলি দেশমাতা আর যে বাঙময় রূপ, তাকে বলি মাতৃভাষা | ভাষার নির্বাক ও বাকমুখর প্রকাশে জন্ম নেয় শিল্প, সাহিত্য, কলা এবং ক্রমশ সেই প্রকাশ বিশ্বময়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই দেশের প্রতীক চিহ্নের স্বাক্ষর হয়ে | আজকের আলোচনার উপজীব্য বিষয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং এই ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য সারা বাংলা জুড়ে কিছু রক্তাক্ত ইতিহাসের ঘটনাবলী |

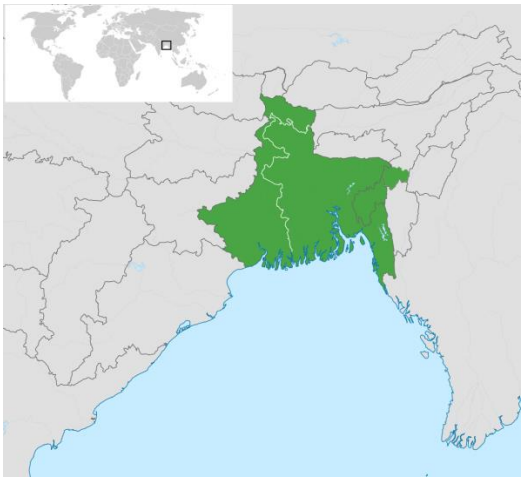

এই বছর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে প্রথমেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি |

'২১শে ফেব্রুয়ারি'কে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে | আসলে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার জন্য লড়াই শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অল্পদিন পর পরই | ঠিক ঠিক অর্থে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮-এ করাচীতে Pakistan Constituent Assembly সভায় শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একা উঠে দাঁড়িয়ে দাবী করেছিলেন বাংলাভাষার ন্যায্য অধিকার | যুক্তি ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার লক্ষ মানুষের মাতৃভাষা যেখানে বাংলা, সেখানে সমগ্র পাকিস্তানের সর্বসম্মিলিত জনসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ | অবশ্যই তা ভাল চোখে দেখা হয়নি সেদিন, কিন্তু সব বাংলাভাষীর এবং ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির এক মহীরুহের বীজ সযত্নে ও স্বাধিকারে রোপণ হয়েছিল সেদিনই |

আমরা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ভাইদের কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করে থাকি কারণ এই ভাইদেরই রক্তে ভাস্বর ২১শে ফেব্রুয়ারী |

নিরস্ত্র যাঁরা সেদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁরা হলেন – আব্দুস সালাম, রফিকুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বর, আবুল বরকত এবং নয় বছরের বালক ওহিউল্লা | প্রাক-১৯৪৭ পূর্ব বাংলার থেকে ১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তান হওয়া এবং তারপরে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ হয়ে ওঠা পর্যন্ত এই চব্বিশ বছরের সময়সীমার পরতে পরতে আছে অনেক সংগ্রাম, আন্দোলন, কান্না ও প্রতিবাদ | ১৯৪৮ সালে শ্রী দত্ত যে স্ফুলিঙ্গের বীজ বপন করেছিলেন, ঢাকার রমনার মাঠে তাই দাউ দাউ করে আগুন হয়ে জ্বলে পুড়ে শেষে শান্তির প্রদীপ এনে দেয় স্বাধীনতাকে; ভাষার দাবীতে এক নতুন দেশের জন্ম হ'ল – বাংলাদেশ |

আজকের ঢাকার প্রাঙ্গণে শহীদ বেদী প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা ভাষার প্রতি আপামর বাঙালির এই শ্রদ্ধা এবং পুষ্পাঞ্জলি|

১৯৪৭-এ বাংলার পশ্চিম দিকটা রয়ে গেল ভারতে, পশ্চিম বাংলা নামক একটি প্রদেশ হয়ে | স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের অগ্রগতি মোড় নিয়েছে অন্য পথে| ভারতের এক ছাতার তলায় বিচিত্রের মাঝে বিবিধ মিলন| বহু ভাষা, ধর্ম, জাতি, উপজাতির মানুষ, সকলেই সমান অধিকারে নাগরিক | তাই সংবিধান রচয়িতারা সমস্ত ভাষার সমান অধিকার ও মর্যাদা স্থাপন করেছেন| এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য নবলব্ধ ভৌগোলিক সীমানা ঘেরা দেশটাকে তাঁরা ভাষাভিত্তিক ব্যবস্থায় পুনর্গঠন করেন| সেই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ভাষার সম্মান পায় বাংলা|

মনে রাখতে হবে, পূর্ব উল্লিখিত তখনকার 'পুব বাংলা' বা 'পূর্ব পাকিস্তান' তখন নিজের ভাষা, সত্তা ও অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে ধীরে ধীরে সোচ্চার হয়ে উঠছিল | প্রদেশ বিভাগের এই পর্বে, ভারতবর্ষেও অনেক ফাঁক ফোকর থেকে গিয়েছিল যার প্রকৃষ্ট উদহারণ – আসামের বরাক উপত্যকা ও বিহারের মানভূম অঞ্চল| সেই কথাতেই আসছি| বিষয়টি আরো সুপরিস্ফুট হবে যদি দেশভাগ সীমারেখার প্রাক ইতিহাসটি আরেকবার মনে করে নিই|

প্রথমে আসছি বরাক উপত্যকার কথায় – কাছাড় জেলা বা পূর্বতন ব্রিটিশ শাসনাধীন এই অঞ্চলটি Surma Valley বলে সুপরিচিত ছিল| এখানকার তদানীন্তন বাসিন্দারা ছিলেন বংশ পরম্পরায় বাঙালি ও বাংলাভাষী| দেশভাগের সময় বরাক উপত্যকাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাকি যে অংশটি রয়ে গেল, সেটি সিলেট জেলা হিসেবে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়| যে অংশটি আসামে থেকে গেল, সেটি কাছাড় জেলার অন্তর্গত হ'ল | কাছাড় ছাড়াও বরাক উপত্যকার অন্য দুই জেলা হ'ল করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি | ভারতের স্বাধীনতার পর এবং প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের পর, আসামে শুধুমাত্র অসমীয়া ভাষাই সরকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়| এই আকস্মিক ব্যবস্থায় কাছাড়ের বাংলাভাষী অধিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে| এদের আন্দোলন ও প্রতিবাদ ছিল অহিংস| ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষের সময় থেকে এই অঞ্চলের ভাষা আন্দোলন এক সংঘবদ্ধ রূপ পায় | শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি থেকে ছোট ছোট দল ক্রমশ একজোট হয়ে গ্রামে গঞ্জে পদযাত্রা করে, পথসভা করে এবং এক সামগ্রিক গ্রামভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে|

১৯৬৮ সালের ১৯শে মে সত্যাগ্রহীরা মিছিল করে ট্রেন বন্ধ করে| এর মোকাবিলা করতে এবং সম্মিলিত জোট রুখতে স্বাধীন ভারতের পুলিশ লাঠিচার্জ করে, এমনকি শিলচর স্টেশনে গুলিবর্ষণও হয় | প্রাণ হারান নয়জন নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ মাতৃভাষার জন্য, ঝরে অনেক রক্ত | অপরাধ? প্রদেশ স্তরে নিজের মাতৃভাষার অধিকারের জন্য এঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন | এঁরা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্র পাল, কুমুদ দাম, তরণী দেবনাথ, জগন্ময় দেব, চন্ডীচরণ সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ, সুনীল সরকার, হিতেশ বিশ্বাস, এবং কানাইলাল নিয়োগী | এবং ১৯৮৬ সালে আরো দুজন মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেন | সেই ভাষা শহিদরা হলেন – জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস|

এবার আসছি মানভূম জেলা সংক্রান্ত বিভাজন ও আন্দোলনের কথায়| এই অঞ্চলের ইতিহাস আরো প্রাচীন, যার শুরু ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগ প্রচেষ্টার উৎসমুখে| সেই সময় Bengal Presidency-র অংশ 'মানভূম' চলে গেল তখনকার বিহারে অথচ মানভূম জেলার শতকরা ৮০ শতাংশ লোকই

বাংলাভাষী ও বাঙালি | ১৯৪০-এ মানভূমে সক্রিয় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, দাবী – মানভূম জেলাকে বিহার থেকে বাংলায় স্থানান্তরিত করা হোক |

১৯৪৭ সালে প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের পরেও এ দাবী মিটল না | এদিকে মানভূম জেলার বাংলাভাষীরা হিন্দিকে মাতৃভাষা বলে মেনে নিতে পারল না, অতএব প্রতিবাদের ঝড় প্রবল হয়ে উঠল | এই অঞ্চলের ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সাজালে এইরকম দাঁড়ায় :

– ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১: সত্যাগ্রহ আন্দোলন

– ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪: হাল জোয়াল আন্দোলন

– ১৯৫৪: শুরু হ'ল টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন

মানভূমের এই ভাষা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা ছিলেন শ্রীমতি ভাবিনী মাহাতো |

তদানীন্তন মানভূমের পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে মাতৃভাষার অধিকার ও ভৌগোলিক সীমা পুনর্নির্ধারণের দাবী নিয়ে ৯৫০ জন পদযাত্রী ১৬ দিন পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন | সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল | এঁরা জেলেও যান সেই অপরাধে | মানভূমবাসীদের লাগাতার এই দাবীতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একটি State Reorganization Commission গঠন করেন | তারপর বিষয়টি পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় – মানভূমকে দ্বিখণ্ডিত করে পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টি এবং সেটিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা | ভাষা আন্দোলনের এটিও একটি স্মরণীয় ইতিহাস | পশ্চিম বাংলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা অপরূপ সুন্দর এই জেলা পুরুলিয়া |

আসলে মানভূম থেকে সিলেট, উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে বাঙালি এক, বাংলাভাষীও এক | আঞ্চলিকতার ভিন্নতা সত্ত্বেও ভাতে এক আর নাড়িতে এক | বাঙালি বহুবিভক্ত নয়, বরং বিবিধের মাঝে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ | মনে পড়ে যাচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত 'পারাপার' কবিতাটি –

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা |
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে –
থাকুক গে পাহারা |
দুয়োরে খিল |
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা |
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা |

বাংলাভাষার প্রতি আপামর বাঙালির এই টান বোধহয় ভাষার এই মাধুর্য ও লালিত্যের জন্য, আমাদের সাহিত্য সম্ভারের জন্য, আমাদের বিশাল সংস্কৃতির ভান্ডারের জন্যই সম্ভব | নিরন্তর কানে বাজে শ্রীপ্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ও বহুল পরিচিত গান:

আমি বাংলায় গান গাই
আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই...
আমি একবার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ...

জীবনানন্দের ভাষায় বলি, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, / তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' | কাজী নজরুলের চোখ দিয়ে, 'ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল / হাসল শিশির দূর্বাঘাসে', এবং আরো নানান কবির চোখ ও ভাষা দিয়ে আমরা দেখেছি মধুকর ডিঙা, হিজল বট, অশ্বত্থের নীল ছায়া, ঘন্টা ফুলের ঘুঙুরের শব্দ, শুকনো পাতার নূপুর | আমরা সুলতানা হই বা অপূর্ব, মহবুব হই বা শ্যামলী, রফিকুলই হই বা ভাবিনী মাহাতো – আমরা বাঙালি, এই আমাদের পরিচয় ও গর্ব |

বাংলা ও বাংলা ভাষার গরবে এই সুদূর হিউস্টনে বসেও প্রবাস বন্ধু হয়ে আমরা বাংলারই জয় গাই, বাংলায় কথা কই | প্রার্থনা করি, আমরা ও বাঙালি পরবর্তী প্রজন্ম যেন মাতৃভাষার এই সম্পদ গরিমা সসম্মানে বুকের মাঝে রাখতে পারি |

(ছবিগুলি অন্তর্জাল থেকে নেওয়া, কৃতজ্ঞতা রইল |)

·····✷·····

বিষ্ণুপুরের গল্পকথা

সুমিতা বসু

বাঁকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ শহর বিষ্ণুপুর লালমাটি টেরাকোটা শিল্পে বাংলার তথা ভারতবর্ষের এক ঐতিহ্যবাহী গৌরব – তবু আমরা ভুলে যাই এখানকার প্রাচুর্যময় অধ্যায়, যে অধ্যায় বারো'শ বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে অবস্থিত কলকাতার কাছেই, মাত্র ১৩২ কিলোমিটার দূরে | এখানে প্রতিটি লাল মাটি, পোড়া ইঁট আজও হাওয়ায় হাওয়ায় ফিসফিস করে গল্প শোনায়, মন্দিরের গল্প, শিল্পীদের গল্প, লাল বাঁধের গল্প – আসছি সে সব কথায়|

বিষ্ণুপুর শহর সত্যিকারেরই এক অবাক বিস্ময় – ইতিহাস, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং এর পাশাপাশি ধ্রুপদী সংগীতের এক মনোময় ও অপরূপ সম্ভার এবং যথার্থ অর্থেই বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী | একে বলা হয়, The Temple Town of Bengal, অর্থাৎ বাংলার মন্দিরনগরী | আবার বিষ্ণুপুরকে পোড়ামাটি বা টেরাকোটার শহর, The Land of Terracotta-ও বলা হয়, যা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব গৌরবের|

ভৌগোলিকভাবে পশ্চিম রাঢ়ভূমি বিস্তৃত ছিল এক বিস্তীর্ণ সীমারেখা জুড়ে | মল্লরাজাদের এই রাজ্যটি বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং বিহারের ছোটনাগপুরের কিছু অংশ জুড়ে ছড়ানো | খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারো'শ/তেরো'শ বছর এই মন্দির সংস্কৃতি ছিল প্রাণবন্ত ও ব্যাপক | আজও বিষ্ণুপুর বাংলার গৌরব ও পর্যটকের স্বর্গ | বিষ্ণুপুরের অগণিত কৃষ্ণ মন্দিরের সঙ্গে বৃন্দাবনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় | তাই বিষ্ণুপুরকে গুপ্ত বৃন্দাবনও (Hidden Brindavan) বলা হয়েছে| আসলে এর একটা সঙ্গত কারণও আছে, আছে মল্লরাজ বীর হাম্বিরের উপর বৃন্দাবনের শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা, সে কথাতেও পরে আসছি|

কলকাতা থেকে ট্রেন বা গাড়িতে বিষ্ণুপুরে পৌঁছানো বেশ সহজ| হোটেল ও রিসোর্টের পাশাপাশি পচিমবঙ্গ সরকারের একটি সুন্দর Guest House-ও আছে, আগে থেকে book করা যায় (www.wbtdcl.com)| উল্লেখযোগ্য, এখানের অজস্র মন্দিরের মধ্যে কোনোটিই কারো সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত নয়, সবকটিই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল | এছাড়াও টেরাকোটা শিল্প, বিষ্টুপুরী সিল্ক, বালুচরী ও স্বর্ণচরী শাড়ি, হরিনাম সংকীর্তন, বাউল গান এবং বিষ্টুপুরী ধ্রুপদী সংগীতের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত এই শহর|

কথিত আছে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে বৃন্দাবনের কাছাকাছি এক রাজ্যের রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে সপরিবারে পুরীতে জগন্নাথ পরিদর্শনে যাত্রা করেন | পথে কোতলপুর বলে একটি জায়গায় তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন | অনন্যোপায় রাজা স্ত্রী ও সেই নবজাত পুত্রকে স্থানীয় মনোহর পঞ্চানন নামক কোনো গৃহস্থের দায়িত্বে রেখে একাই পুরীর উদ্দেশ্যে চলে যান | তারপর সেই রাজার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি, এমনকি নবজাতকের মাও খুব শিগগিরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন|

অনাথ শিশু পুত্রটি খুব সাধারণভাবেই গৃহস্থের গৃহে বড় হতে লাগল | আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতো সে খেলাধূলা করে, মাঠে কাজ করে, গরু চরায় | একদিন গৃহস্থ একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন | বালকটি গরু চরাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে মাঠে নিদ্রামগ্ন, আর একটি বিশাল সাপ তার ফণা তুলে তাকে ছায়া দিচ্ছে| তিনি বুঝলেন এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, ছেলেটির মধ্যে রাজলক্ষণ আছে| সঙ্গে সঙ্গে তাকে যথাযথ অস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করলেন|

বালকটি নিজের যোগ্যতা অনুসারে মল্লবীর হয়ে উঠল এবং এখান থেকেই এই আদি-মল্লকে ঘিরে শুরু হ'ল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়| তাই বাংলার এই অঞ্চলকে বলে মল্লভূম| মল্ল শব্দটির সংস্কৃত অর্থ, বীর বা কুস্তিগীর | মল্লরাজাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার আছে – সন তারিখটা এইভাবে হিসেব হয়েছে – খীষ্টাব্দ ৬৯৪ হ'ল মল্লাব্দ ০১ আর সেটিই বঙ্গাব্দ ১০১, এবং স্থানে স্থানে মন্দিরগাত্রে তা পাথরের ফলকে চিহ্নিত|

আদি-মল্ল রঘুনাথ নামে পরিচিত | নিকটবর্তী প্রদ্যুম্নপুরে স্থাপিত হ'ল তাঁর রাজ্য | এঁর পরবর্তী এই বংশের এক পুরুষ জগৎ মল্ল (১৯তম মল্ল), বন বিহারে গিয়ে আকাশবার্তায় মায়ের আজ্ঞা পেয়ে পরে বিষ্ণুপুরে তাঁর রাজধানীটি সরিয়ে আনেন | মৃন্ময়ীদেবীর আজ্ঞা পেয়েই মৃন্ময়ী মন্দির স্থাপন করেন, যা হাজারেরও বেশি বছর পরেও প্রাচীন ঐতিহ্যকে বুকে নিয়ে আজও সগৌরবে বিদ্যমান |

এখানে নিত্য পূজা ছাড়াও প্রতি বছর মহা সমারোহে বাৎসরিক পূজাও হয় | এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম এবং একটি প্রাচীনতম রাজবাড়ির দুর্গাপূজা |

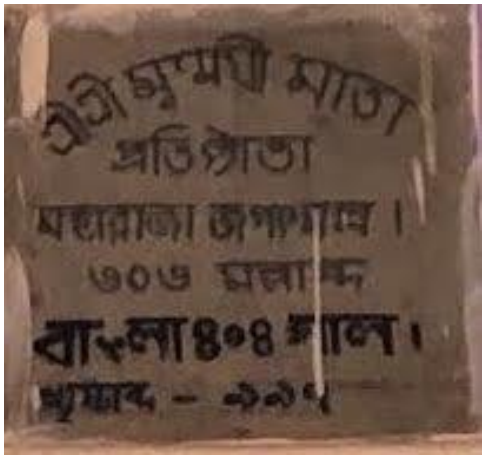

এই পূজার রীতিনীতি আরো পাঁচটি পূজার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন | দেবীমূর্তির মুখাবয়ব ঠিক আমাদের পরিচিত দুর্গা মায়ের মতো নয় | সেই আদিকাল থেকে একই মূর্তি আছে, বাৎসরিক পুজো হয় ঘটে |

বাইরে মন্দিরগাত্রে যে নারীদের ভাস্কর্য আছে তাতে রাজস্থানী রং ও পোশাকের সাদৃশ্য পাওয়া যায় |

প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে পূজা শুরু হয় মহাসপ্তমীর উনিশ দিন আগে, মহাঅষ্টমীর শুভক্ষণে কামান ফাটানো, তারপর মায়ের বিদায়বার্তা নিয়ে মহাদশমীর দিন নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে পূজার সমাপ্তি – সবই এক অনন্য ঘরানার | মায়ের পূজায় সব সন্তানই সমান তাই এখনো পূজার উৎসবে নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন ও নানা ধর্মের মানুষজনের সমাগম দেখে মনে হয় এ যেন 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' |

ফিরে আসি জগৎ মল্লের কথায়, মৃন্ময়ীদেবীর আজ্ঞায় প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পরও আরো ৪৩ জন মল্লরাজা বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করেন | শেষ মল্ল ছিলেন কালীপদ সিংহঠাকুর, যিনি ১৯৮৩ সালে দেহত্যাগ করেন | আজও বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী মন্দিরের কাছাকাছি এখন রাজা না থাকলেও রাজপরিবারের মানুষজন বসবাস করেন |

জগৎ মল্লের বেশ অনেক পুরুষ পরে মল্লরাজ হন বীর হাম্বির | তখন বাংলার এদিকে পাঠান দস্যুদের খুব উৎপাত | হাম্বির পাঠান সর্দার দায়ুদ খানকে পরাজিত করেন এবং পাঠান দমনে মুঘল সম্রাটদের সহায়তা করেন | ক্রমশ ভারত জুড়ে তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে | হাম্বির মল্ল যিনি বীর হাম্বির নামে খ্যাত, রাজত্ব করেছেন ১৫৬৫ থেকে ১৬২০ পর্যন্ত – দিল্লির মসনদে তখন সম্রাট আকবর | বীর হাম্বির ছিলেন ৪৯-তম মল্লরাজা | পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হলে বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন | এই সময়ই তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন |

ঘটনাটি হ'ল এইরকম, সেই সময় বৃন্দাবন থেকে শ্রীনিবাস আচার্যকে পূর্বদিকে নতুন করে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য পাঠানো হয়, সঙ্গে ছিল ওই সংক্রান্ত প্রচুর কাব্যগ্রন্থ ও পুঁথি | পথে সেগুলি হারিয়ে বা চুরি যাওয়াতে মল্ল রাজকোর্টে এসে তিনি তাঁর বাগ্মিতায় এবং কৃষ্ণ জীবনলীলা স্বকণ্ঠে অনায়াসে ও অবলীলায় আবৃত্তি করে সকলকে বাকরুদ্ধ করে দেন | রাজা বীর হাম্বির শুধু মুগ্ধ নন, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর আপ্লুত ভক্তি এবং শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রদ্ধা মল্লরাজভূমিকে করে তুলল গুপ্ত বৃন্দাবন, যা আজও ইতিহাসের সাক্ষী নিয়ে বিরাজমান | শ্রীনিবাসকে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন বিষ্ণুপুরেই থেকে যেতে, কারণ তাঁর বিহনে বিষ্ণুপুর এক অতি সাধারণ রাজ্য ও গভীর জঙ্গল হয়েই থেকে যাবে | বিষ্ণুপুরের আরেক গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা এই সময়েই | বাঁকুড়ার এই দিকটা তখন ছিল লালমাটি ও রুক্ষ জমি, ঘন শালবনের গভীর জঙ্গল | এখানে জঙ্গল এতই ঘন ছিল যে আগে এই জায়গাকে বলা হতো বনবিষ্ণুপুর | বীর হাম্বির ও তাঁর বংশধরেরা ছিলেন প্রজাবৎসল এবং স্থানীয় প্রজাদের জনজীবন ও কৃষিকাজের সুবিধার্থে হাম্বিরের উদ্যোগে খনন করা হয় একের পর এক বাঁধ, সব মিলিয়ে সাতটি – কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, লালবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, যমুনাবাঁধ, পোকাবাঁধ ও গাঁতাঁতবাঁধ |

লালবাঁধ নিয়ে রাজপরিবারের এক দুর্ভাগ্যজনিত কাহিনী

আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে... গল্পটি নানান কথনে একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, তবু তার সারাংশ হ'ল এই রকম: সময়টা ১৭৩২, ২য় রঘুনাথ সিংহদেব তখন মল্লরাজ | উড়িষ্যা থেকে এক অপূর্ব সুন্দরী নর্তকী, লালবাঈ এল বিষ্ণুপুরে | বিষ্ণুপুরে তো নাচ গান শিল্পের কদর বরাবরই, তাই তার উপস্থিতি আরো জমজমাট করে তুলল রাজসভার এই আমোদ প্রমোদকে | রাজা নর্তকীর প্রেমে আত্মহারা এবং তার সঙ্গেই নৌকা বিহার ও বিলাস ব্যসনে দিনযাপন করতে লাগলেন | নর্তকী লালবাঈ-এর গর্ভে রাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল | রাজ্যের কাজকর্ম উঠল মাথায় এবং স্বভাবতই রাণী এবং অন্যান্য প্রজারা এটা ভাল চোখে দেখলেন না | রাণী চন্দ্রপ্রভা এবং আর সকলের ষড়যন্ত্রে একদিন নৌকার তলায় ফুটো করে এবং নৌকার ভিতরে পাথর রেখে লালবাঁধের মাঝে সপুত্র নর্তকীকে ডুবিয়ে হত্যা করা হ'ল | কেউ কেউ বলে, সন্ধ্যের অন্ধকারে এখনো নাকি শোনা যায় লালবাঈ-এর করুণ কান্না | লালবাঈকে নিয়ে বাংলায় অনেক গল্প, উপন্যাস, নাটকও লেখা হয়েছে |

বিষ্ণুপুরের মন্দির সংলগ্ন গুমঘরটিও একটি দ্রষ্টব্য

বিষয় | এর ভেতরে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গও আছে | শত্রু বা অপরাধীদের নাকি এখানে আটকে রেখে মেরে ফেলা হতো – শত শত বছরের অন্যায়, পাপ, শত্রুতা, হিংসা ও জিঘাংসার স্বাক্ষর এখানে প্রতিটি লাল ইঁটের বুকে – সাক্ষী শুধু নীরব আলোছায়া মাখা ইতিহাস | কেউ কেউ যদিও বলেন এটি নাকি রাজাদের জলের ট্যাংক ছিল কারণ কিছু জলের পাইপ পাওয়া গেছে কাছাকাছি | মতান্তরে, রাজাদের অন্ন সংগ্রহ করা থাকত | যাই হোক না কেন, গুমঘরটির রহস্য আজও পর্যটকদের একটা গা ছমছম করা অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় |

বিষ্ণুপুরের মন্দির গঠনের কাজ সর্বজনবিদিত। মনে প্রশ্ন জাগে, রাজারা বড় বড় দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ গঠন না করে এত মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন কেন? এর প্রধান উত্তর বোধহয় তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মভাবাপন্নতা। বীর হাম্বির নিজেই ১০৮টি মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরের স্থাপত্যের দিকেও অভিনবত্ব দেখা যায় - একচালা, দোচালা, চারচালা ও আটচালা মন্দিরের নিদর্শন আজও আছে। মন্দির-চূড়ার গঠন স্থাপত্যেও ছিল বৈশিষ্ট্য, যেমন এক চূড়াকে একরত্ন, দুই চূড়াকে দুইরত্ন ইত্যাদি, পাঁচ রত্ন মন্দিরও দেখা যায়।

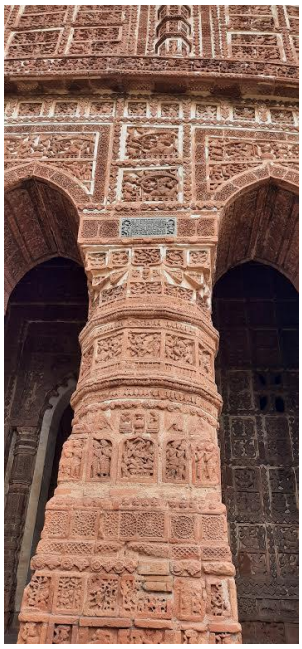

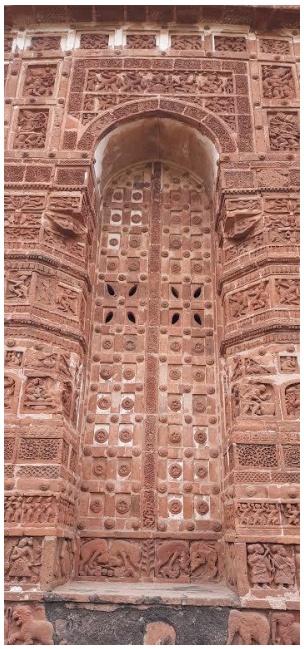

অলংকরণে নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি আছে শিল্পচর্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কৃষ্ণলীলার নিদর্শন আছে প্রায় সব মন্দিরগাত্রে, আছে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনীর নমুনা। আবার সামাজিক প্রতিফলনও ইতিহাসের বুকে মুদ্রিত করতে শিল্পীরা ছিলেন যত্নবান। তাই পর্তুগীজ যুদ্ধের প্রতিফলন, চীন থেকে আগত অতিথির মূর্তিও মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে জাজ্বল্যমান।

মন্দির গাত্রে জ্যামিতিক নকশা ও ফুলকারির অপূর্ব কাজ দেখে বোঝা যায় যে এতে প্রতিভাবান মুসলিম শিল্পীদের অবদানও বিদ্যমান। শিল্পীগোষ্ঠীতে যে ধর্মের সীমাবদ্ধতা কোনো বাধা ছিল না, বিষ্ণুপুরের মন্দির গাত্র আজও তার স্বাক্ষর বহন করছে আপন গরিমায়।

এখানে বিষ্ণুপুরী উচ্চাঙ্গ সংগীত ও তার ঘরানার কথা একটু আলোচনা করা যাক। বিষ্ণুপুরী ঘরানার মধ্যেই আছে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ভজন, গজল ইত্যাদি। দিল্লিতে তখন সম্রাট দ্বিতীয় শা-আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) মুঘল সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত। তাই দরবারের সব গুণী গায়ক গায়িকারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লেন। তানসেন বংশীয়রা এলেন পূর্বদিকে – তাঁরা কাশীর রাজা, অযোধ্যার নবাব ইত্যাদি দরবারে আশ্রয় নিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তানসেন ধারারই বাহাদুর খাঁ ও তাঁর সঙ্গে এক দল এলেন বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। বিষ্ণুপুরে তখন রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকাল। সমাদরে তাঁদের রাজসভায় যোগ্য সম্মান দিয়ে বসানো হ'ল।

তানসেনী হিন্দুস্থানী সংগীতে সুপন্ডিত ও পারদর্শী বাহাদুর খাঁ-র শিষ্যত্ব নিলেন গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, নিতাই ও বৃন্দাবন নজির প্রমুখ। এঁদের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি ছিলেন মল্লরাজ

চৈতন্য সিংহদেবের (৫৬ তম মল্ল) সভাগায়ক | এই রামশঙ্করের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কেশবলাল চক্রবর্তী, রামকেশব, দীনবন্ধু, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদুভট্ট | আর এই যদুভট্টের হাত ধরে বালক রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোতে শুরু ধ্রুপদী গানের প্রথম সংগীত আলাপন | ধুর্জটিপ্রসাদকে লেখা এক চিঠিতে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে"... | প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, সংগীত সাধক যদুভট্টও সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের গুরু রামশঙ্করের কাছ থেকে |

যদুভট্ট সম্পর্কে ছেলেবেলার কথায় কবির স্মৃতিচারণে শুনি, "বাল্যকালে আমাদের ঘরে ওস্তাদের অভাব ছিল না; সুদূর অযোধ্যা, গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে ওস্তাদ আসত | তাছাড়া বড় বড় ওস্তাদ ঘরেও বাঁধা ছিল | কিন্তু আমার একটা গুণ আছে – তখনো কিছু শিখিনি, মাস্টারির ভঙ্গি দেখালেই দৌড় দিয়েছি | যদুভট্ট, আমাদের গানের মাস্টার আমায় ধরবার চেষ্টা করতেন | আমি তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে দৌড় দিতাম | তিনি আমাদের কানাড়া গান শিখাতে চাইতেন | বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি | তাঁর প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা | আমি অত্যন্ত 'পলাতকা' ছিলুম বলে কিছু শিখিনি..."

আরেকবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বালককালে যদুভট্টকে জানতাম | তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড় | তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয় | তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত | তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না | সম্ভবত তাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল, অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরো বেশি ছিল, তাঁদের কসরতও ছিল বহুসাধনাসাধ্য, কিন্তু যদুভট্টর মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ |...যাইহোক, ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরি হতে পারে, যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্তরচিত |" রবীন্দ্রসংগীতে যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, তা এসেছে বিষ্ণুপুরী ঘরানা থেকেই আর কবি যদুভট্টের কাছে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও আজীবন এই সুর, মীড় ও ঠাটের তান কবিকে টেনে রেখেছিল – তাই রবীন্দ্রসংগীতের 'ভাঙা গানের' জন্মসূত্রটি লুকিয়ে আছে বিষ্ণুপুর ঘরানায় |

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকে প্রাণের রসদ নিয়েছিলেন কবিগুরু তারপর তাকে আত্মস্থ করে গড়ে তুলেছেন এক নতুন ধারা, কারণ তিনি বার বার বিশ্বাস করেছিলেন, "হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্টেটারদের আমি মানিনে | যাঁরা বলেন ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই – ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম..." (৭ই জানুয়ারি ১৯৩৫ / রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রালাপ)|

যাইহোক, আবার ফিরে আসি বিষ্ণুপুরী সংগীত ইতিহাসের কথায় – তানসেন ধারার এই শিল্পীরা ভারতের পূর্বদিকে এসে এবং ধ্রুপদী সংগীতকে তাঁদের প্রাণকোষে সযত্নে রেখে বাংলার সংগীত জগৎকে উন্মুক্ত ও ব্যাপ্ত করেছিলেন | শ্রী শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' বইতে লিখেছেন, "এই বিষ্ণুপুরীরা সূত্রপাতে বাহাদুর খাঁর কাছে পেয়েছিলেন তানসেনী বা সেনী ঘরানার ধ্রুপদ... শোনা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কানাই চক্রবর্তী ও মাধবলাল চক্রবর্তী নামে দুই ভাই উল্লিখিত সদারঙ্গের শিষ্যবংশীয় মহম্মদ খাঁর কাছে শিখে প্রথম খেয়ালের চলন করেন | বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা মদনমোহন সিং এঁদের একাজে উৎসাহিত করেন | ...বিষ্ণুপুরের গাইয়েদের একটা গুণ ছিল, এঁরা সব সময় নুতন কিছু শেখবার চেষ্টা করতেন |... তাঁদের কাছে সংগীত ছিল সজীব প্রাণের প্রবাহ | ...গুরুদেবের গানে ও বাংলার উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরী ঢং নাম বাংলায় প্রচলিত পদ্ধতিই প্রবল |"

বিষ্ণুপুর ভ্রমণের প্রথম দর্শনীয় স্থানটিই হ'ল রাসমঞ্চ, ১৬০০ শতাব্দীতে বীর হাম্বিরের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে

স্থাপিত | মল্লরাজাদের সময়ে রাস উৎসব একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল | ১৬০০ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত রাসমঞ্চটি রাস উৎসবের মূল মঞ্চ ছিল | এই সময় জনসাধারণের জন্যে আর সমস্ত মন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে এনে সাজানো হতো এবং শোনা যায় হাম্বিরসহ পরবর্তী মল্লরাজারাও নিজেরাই উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন | পোড়ামাটির এই সৌধটির স্থাপত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের এক অপরূপ নিদর্শন | এটির নিচের খিলানগুলি মুসলিম স্থাপত্যের মতো, তার উপরের চালাটি ঠিক বাংলার চালার মতো, এবং তারও ওপরে

গম্বুজে পিরামিডের আকৃতি | রাসমঞ্চের পিরামিড চূড়া ছাড়াও কোনো জায়গায় গ্রীক অথবা ইজিপ্সিয়ান প্রভাবও দৃশ্যতঃ বিদ্যমান, নারীদের সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাসও মন্দিরগাত্রে দক্ষভাবে ভাস্কর্যে চিহ্নিত |

অনতিদূরেই আছে মদনমোহন মন্দিরটি, যেখানে

নিত্যসেবা আজও অব্যাহত আছে | মল্লরাজ দুর্জন সিং ১৬৯৪ সালে এটি স্থাপন করেন | এটিতে উপরের অংশে যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী, দশাবতার ইত্যাদি ভাস্কর্যে চিহ্নিত, আবার নিচের অংশটিতে পশুপাখি সমেত তখনকার সামাজিক চিত্রও আছে | মদনমোহনের এই মন্দিরটি একচূড়া বা একরত্ন মন্দির |

শ্যামরায় মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দির অর্থাৎ পাঁচচূড়া | ইংরেজি ১৬৪৩ সালে মল্লরাজ রঘুনাথ সিং এটি প্রতিষ্ঠা করেন | রঘুনাথ ছিলেন বীর হাম্বিরের পুত্র | মন্দিরটি মল্ল শক ৯৪৯ খোদাই করা আছে, এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম ও বংশপরিচয়ও মন্দির গাত্রে মুদ্রিত | পোড়ামাটির অনবদ্য অলংকরণে মন্দিরটি অতি মনোহর |

বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন কৃষ্ণরায় বা জোড়বাংলা মন্দিরটি ১৬৫৫ খীষ্টাব্দে রঘুনাথ সিং-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত | দুটি সংযুক্ত দোচালা দিয়ে তৈরী এই মন্দির, তাই নামে আছে জোড়া শব্দটি | পোড়ামাটির নিপুণ এবং অসাধারণ অলংকরণে মন্দিরটি অপূর্ব বললেও বোধহয় কম বলা হয় | এক কথায় রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, শিকার দৃশ্য,

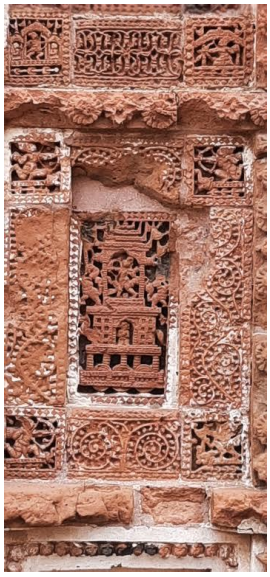

সামাজিক দৃশ্যের মধ্যে মাঝ নদীতে নৌকা, নারীদের কেশ বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা, বাংলার তথা ভারতের তদানীন্তন এবং পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাস নিপুণ পোড়ামাটির ভাস্কর্যে আজও ভাস্বর|

রাধামাধব মন্দিরের স্থাপত্যে খাঁজ কাটাকাটা জৈন শিল্পের ছাপ আছে | ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে সব ধর্ম ও সব স্থাপত্যের প্রভাব ও স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট|

বিষ্ণুপুরে আরো অজস্র মন্দির এবং দ্রষ্টব্য স্থান আছে – যেমন রাধাশ্যাম মন্দির, রাধালালজীউ, নন্দলাল, কালাচাঁদ,

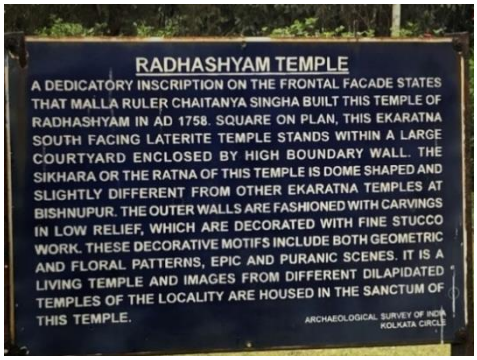

রাধাগোবিন্দ, যুগলকিশোর, কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির, দলমাদাল কামান ইত্যাদি, এখানে স্থানাভাবে যাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল না | দশমহাবিদ্যার মধ্যে ছিন্নমস্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | বিষ্ণুপুরে এই ছিন্নমস্তার মন্দিরটি একটি অখণ্ড শ্বেতপাথর কেটে তৈরী | মন্দিরটি একেবারে আধুনিক কালে স্থাপিত (১৯৭৩ সালে)| কৃষ্ণচন্দ্র গুঁই বামাখ্যাপার স্বপ্নাদেশে এটি নির্মাণ করেন|

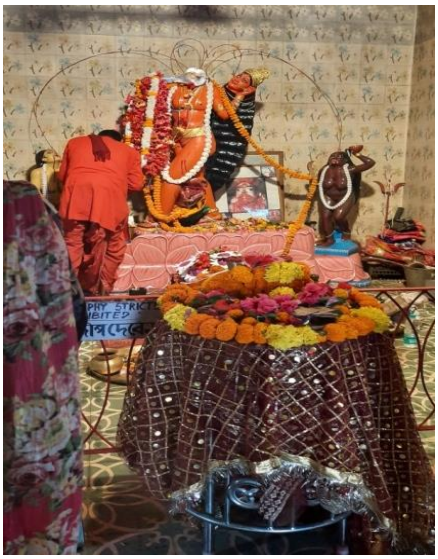

এছাড়াও আছে বড় বড় টেরাকোটার অসাধারণ স্থাপত্য, যেমন বড় পাথর দরজা, ছোট পাথর দরজা, পাথরের রথ ইত্যাদি| মাকরা পাথরের তৈরী ছোট দরজাটি নগরের প্রবেশ-দ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় মল্লরাজ বীর সিংহের সময়ে|

এখানের বালুচরী ও স্বর্ণচরী শাড়ির নাম বাঙালি মেয়েদের আলমারির মর্যাদা | বালুচরী শাড়ির ঐতিহ্য কিন্তু বিষ্ণুপুরে এসেছে মাত্র গত দু'শ বছর আগে| আগে মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর অঞ্চলে বিশেষ তাঁতে বোনা হতো এই সিল্ক শাড়ী| আর যেগুলিতে জরি থাকে তাকে বলে স্বর্ণচরী| মানুষের প্রতিকৃতি দিয়ে হাতে-করা নকশাই এর বৈশিষ্ট্য | সাধারণতঃ একটি শাড়ী বুনতেই একজন তাঁতীর এক মাস বা তার বেশী সময় লেগে যায়|

কলকাতার এত কাছে যে এত সুন্দর ও সাংস্কৃতিক প্রাচুর্যময় এক শহর আছে, আমরা অনেকেই হয়তো তা ভাল করে জানি না| আশা করি এই লেখা পড়ে ও ছবি দেখে, পরের বার কলকাতায় গেলে কেউ কেউ অন্ততঃ দু'তিন দিনের জন্য নিজের চোখে দেখে আসবেন | এখন অনেক মন্দিরই সরকার আয়ত্তাধীন অথবা পুরাতাত্ত্বিক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং মন্দির প্রাঙ্গণ অত্যন্ত সুন্দর ফুলের বাগান দিয়ে সাজানো|

বাংলার গৌরব বিষ্ণুপুর ও মল্লরাজাদের হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের সকলকে দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে | ইতিহাস ডাকছে হাতছানি দিয়ে, শুনতে পাচ্ছেন না?

সরকারী ও পুরাতাত্ত্বিক তত্ত্বাবধানে মন্দিরগুলি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থান হিসাবে অসাধারণ এবং সুসংরক্ষিত | এগুলিতে বিগ্রহ না থাকলেও ইতিহাসের মর্যাদায় ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে বিষ্ণুপুর বাংলার গর্ব|

দুটি ভাল অভিজ্ঞতার কথা

মৃণাল চৌধুরী

এটি গল্প নাকি রচনা, বলতে পারব না | তবে দুটি খুবই অভিনব অভিজ্ঞতা হয়েছে এবার দেশে গিয়ে, যা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছায় লিখছি |

আমাদের সাহিত্য সভার মতোই কলকাতায় একটা সংস্থা আছে, যার নাম "পোয়েটস ফাউন্ডেশন" (Poets Foundation) | সংস্থার কর্ণধার শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরীর সাথে আলাপ হয়ে অত্যন্ত ভাল লেগেছে | অমায়িক একজন মানুষ | অত্যন্ত সহজ সরল | সবসময় অন্য কারও জন্য কিছু করার জন্য প্রস্তুত | প্রথম দিনই আমাকে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের গেস্ট হাউস থেকে তুলে, নিজে গাড়ি চালিয়ে ওঁর ফার্ন রোডের বাড়িতে নিয়ে গেলেন | বাড়িতে ঢুকে দেখি টেবিলে আমার জন্য খাবার সাজানো |

সম্প্রতি টেগোর সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্কের উদ্যোগে উত্তম কুমারের ওপর যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রকাশনা করেছে পোয়েটস ফাউন্ডেশন | সেই সূত্রেই ওঁর সাথে যোগাযোগ | সবটাই ফোনে; সাক্ষাৎ এবার দেশে গিয়ে |

পেশায় প্রদীপবাবু এঞ্জিনিয়ার | জাপানে শিক্ষালাভ করেছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্টে | অল্প বয়সেই বহু বেসরকারি ও সরকারি পদের দায়িত্ব পালন করেছেন | পরিণত বয়সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশ কিছু শিল্পোদ্যোগে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন | কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখি ও নানারকম সমাজ সেবার কাজে বরাবর নিজেকে নিয়োজিত করেছেন |

প্রদীপ কুমার চৌধুরী

কৈশোর থেকেই নানা পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন | কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লিখে পাঠককে অভিভূত করেছেন | ভ্রমণ করেছেন এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন শহর, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক গ্রাম-নগর-মহানগর | সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন দেশ-বিদেশের নানা সম্মানিত সংস্থার সাথে | অবসর গ্রহণের পর দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন এবং করছেন | ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন আন্তর্জাতিক সমাজসেবা সংস্থা "পোয়েটস ফাউন্ডেশন", আজও কাজ করছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে | সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করছেন ইংরেজি পত্রিকা "পোয়েট্রি টুডে" আর বাংলা পত্রিকা "সাহিত্য সাগর"-এর জন্মলগ্ন থেকে | প্রকৃত মুক্তির জন্য মগ্ন হয়ে থাকেন বাংলা ভাষার অক্ষরে আর সৃষ্টিকাজে |

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পোয়েটস ফাউন্ডেশন তো সাহিত্য ছাড়া নানারকম সমাজসেবার কাজেও সমানভাবে যুক্ত, তাহলে সংস্থার নাম "পোয়েটস ফাউন্ডেশন" হ'ল কেন? বলেছিলেন, "আমাদের এই সংস্থা প্রথমে মূলতঃ সাহিত্য বিষয়ক ছিল, অনেক কবি, সাহিত্যিক এর সাথে যুক্ত ছিলেন | নামটা দিয়েছিলেন স্বর্গতঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | পরবর্তী সময়ে পোয়েটস ফাউন্ডেশন সাহিত্যের সাথে নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজেও নিযুক্ত হয় | নামটা যেহেতু সুনীলদা দিয়েছিলেন, সকলের ইচ্ছেয় সে নাম আর বদলানো হয়নি |

আমার দ্বিতীয় ভাল লাগাটা হ'ল বেনারস ভ্রমণ আর তার সঙ্গে বেনারসের শান্ত সমাহিত রূপ অনুভব করা | এর আগে কখনো যাইনি, এই আমার প্রথম বেনারস দর্শন | আমার মনে হয়েছে বেনারস এক আধ্যাত্মিক জাগরণের শহর |

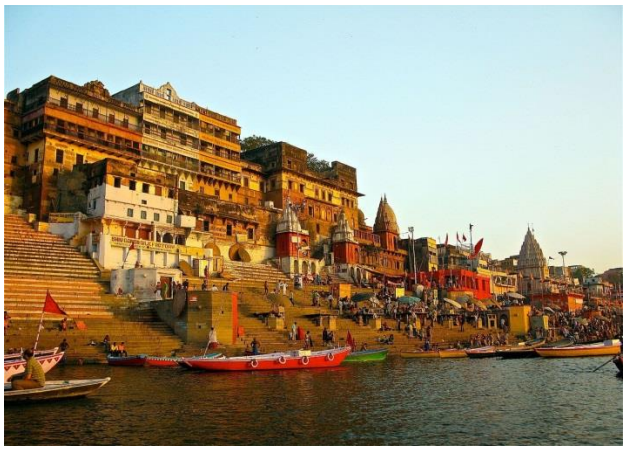

সারা শহরে কেমন একটা শান্তি বিচরণ করে – যা দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়; যা সর্বতোভাবে মনকে শান্ত করে | অকারণ কর্মব্যস্ততা হৈচৈ অনুভব করিনি সেখানে | সারা শহরে কোন উত্তেজনা নেই, কেমন একটা অন্তরীণ নিরুদ্বেগ শান্ত মনোভাব অনুভব করেছি | হয়তো গঙ্গায় নৌকো করে ঘাটগুলো পরিদর্শন আর উদাত্ত কণ্ঠে সুরেলা মন্ত্র উচ্চারণ শুনে মনটা শান্তিতে ভরে ওঠার ফল |

অনেককাল দেশে না থাকায় ধারনাই ছিল না যে কলকাতা থেকে বিমানে এত সুবিধায় বেনারসে যাওয়া যায় | দেড় ঘন্টায় পৌঁছে গেছি বেনারসের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিমান বন্দরে | এই বিমান বন্দরটি তৈরি হয়েছিল ২০০৫ সালে | এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর; সাজানো গোছানো সুন্দর ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছি |

আরও মুগ্ধ হয়েছি বিমান বন্দর থেকে হাইওয়ে ধরে গাড়ি করে শহরে পৌঁছানোর সময় | বেনারসের মতো অতি পুরনো একটি শহরে এত আধুনিক রাস্তাঘাটের সমন্বয় দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি | জানতে ইচ্ছে হয়েছিল কী জাদু মন্ত্রে এটা সম্ভব হয়েছে!

প্রধানমন্ত্রী মোদী বেনারস থেকেই ২০১৪ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন | বেনারসের প্রতি তাই তাঁর অসীম দরদ | কাশী অর্থাৎ বেনারসের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “Kashi owns me, I am imprisoned in your love.” এই ভালবাসার খাতিরে গত ৪-৫ বছরে বেনারসের প্রভূত উন্নতি হয়েছে | পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, “There is a lot of work that God has put me on this earth for. A lot of it is dirty work, but I’m up to the task.”

তখন থেকে বেনারসে তৈরি হয়েছে আধুনিক বড় বড় চওড়া রাস্তা, এক্সপ্রেস ট্রেন, আধুনিক ট্রাফিক কন্ট্রোল, কনভেনশন সেন্টার, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার রাস্তাঘাট | প্রথম ক্ষেপে মূল শহরকে এড়িয়ে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার জন্য “রোড” নামে এক এক্সপ্রেস রাস্তা তৈরি হয়েছে ২০১৮ সালে | গত ৩-৪ বছরে বেনারস নিজের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বজায় রেখে আদ্দিকালের ঘিঞ্জি পুরনো শহর থেকে আধুনিক শহরে পরিণত হওয়ার প্রধম ধাপ অতিক্রম করেছে |

এ যাবৎ জেনে এসেছি, বেনারস মানে ছোট ছোট ঘিঞ্জি, নোংরা রাস্তা; অবাধে ষাঁড়, গরু, মোষ, ছাগল ঘুরে বেড়ায় | ওটাই ছিল বেনারসের বিশেষত্ব | যদিও এখনও কিছু ছোট ছোট গলি-রাস্তা আছে, কিন্তু মোটের ওপর রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন |

ভাল লেগেছে উত্তর প্রদেশের "বাটি চোকা" রেস্তোরাঁটি | জেনেছি কলকাতার সল্ট লেকে এর একটি শাখা আছে | মূল রেস্তোরাঁয় ঢুকতে গেলে জুতো খুলে ঢুকতে হয় |

রেস্তোরাঁটি খুবই বড় এবং সুন্দরভাবে সাজানো | বিশাল পাতায় খাবার পরিবেশন করার ব্যবস্থা সেখানে |

একদিন আমরা সারনাথের বৌদ্ধ মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম | সারনাথের পুরনো বৌদ্ধ স্তূপগুলি আর বৌদ্ধ মন্দির অতি মনোরম; দেখে মনে শান্তি আসে |

বেনারসের অভিজ্ঞতা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে |

.....✸.....

বিশ্বায়ন

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের দুপুরে তিনটের হাওড়া-কাটোয়া লোকাল জিরাট স্টেশনে এসে দাঁড়াল | এক বৃদ্ধ জিনিসপত্রভরা একটা বস্তা আর কয়েকটা ব্যাগ নিয়ে ট্রেন থেকে নামলেন | ট্রেনের এক যুবক সহযাত্রী ওঁকে নামতে সাহায্য করল | ট্রেন হুইসল বাজিয়ে কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল | এই গ্রীষ্মের দুপুরে ট্রেন থেকে বেশি লোক নামেনি | বৃদ্ধ এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজছেন | একটু পরেই চোখে পড়ল তারককে | ও কোনদিন দেরী করে না | কোনদিন বলা ভুল হ'ল, মাসে একটা দিনই তারককে আসতে হয় বাবাকে নিতে | একটু বড় হয়ে সাইকেল চালাতে শেখার পর থেকেই ও এই কাজটা উৎসাহ করেই নিয়ে নিয়েছে | বাবা ঐদিন বস্তা করে জিনিস আনে, অনেক শিষ্য তারকের জন্যেও কিছু কিছু জিনিস পাঠায় | ছোটবেলায় এইটা ওর উৎসাহের কারণ ছিল, এখন ও অবশ্য অনেক বড় হয়ে গেছে | এখন বাবাকে নিতে আসা ওর কর্তব্য |

সদানন্দ দেখেন তারকের আসার ছন্দটা কেমন যেন ম্রিয়মাণ | সে এসে মাথা নীচু করে বস্তাটা আর ব্যাগগুলো তুলতে যায় |

- কীরে, রেজাল্ট বেরিয়েছে?

তারক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে | সদানন্দ আর কথা বাড়ান না, বুঝে যান তারক এবারও পাশ করেনি | ব্যাগগুলো সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে, বস্তাটা ক্যারিয়ারে আটকে ওরা বাড়ির পথ ধরে | দুচারটে রিক্সা আজকাল স্টেশনে থাকে কিন্তু এই সময়ে তাদের পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না | তাই এইভাবেই প্রতিমাসে ওরা বাড়ি যায় |

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওরা পিচের রাস্তা ধরে এগোয় | রেললাইনগুলো পাতা হয়েছিল পুরনো গ্রামগুলোর থেকে একটু দূর দিয়ে | ফলে স্টেশনগুলো ছিল সব গ্রামের বাইরে | স্টেশন সংলগ্ন চারদিকে যে বিপুল ফাঁকা জায়গা ছিল দেশভাগের পর সেখানে কলোনি স্থাপন করা হয় | স্বাধীনতার পরের এই কুড়ি বছরে স্টেশন সংলগ্ন জায়গাগুলো বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে | পাকা রাস্তা হয়েছে | কিন্তু পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলো এখনও সেই তিমিরেই আছে | ওরা পাকা রাস্তায় কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে কাঁচা রাস্তা ধরে | আর কিছুদূর গেলেই বলাগড় গ্রাম |

পাশের গ্রাম জিরাট, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান | তিনি এখানে বাস করেননি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর গ্রামে যাতায়াত ছিল | তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ তিনি জিরাট গ্রাম থেকে দেবেন মনস্থ করে জিরাট-বলাগড় ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে প্রস্তাব পাঠান | তিনি জানিয়েছিলেন সমাজ তাঁকে সমর্থন করলে তিনি জিরাট থেকে বলাগড় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটা পাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন | কিন্তু সেদিনের ব্রাহ্মণ সমাজ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল | পঞ্চাশ বছর পরেও সেই রাস্তা এখনও কাঁচা | সদানন্দবাবু কম বয়সে যখন এই গল্প শুনেছিলেন তখন অন্যরকম ভাবলেও এই পরিণত বয়সে এসে ভাবেন – সেদিন ব্রাহ্মণ সমাজ ঠিকই করেছিল | চোখের সামনে তিনি সমাজকে শেষ হয়ে যেতে দেখছেন | পিতৃস্থানীয়রা সেদিন দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিলেন, নইলে এতদিনে সবই শেষ হয়ে যেত | কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে, এখনও ব্রাহ্মণের সম্মান আছে | তাই তো তিনি করে খাচ্ছেন |

বলাগড় গ্রামে প্রবেশ করে ওরা আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে গাছগাছালিতে ঢাকা মাটির রাস্তা ধরে বাড়ি পৌঁছান | এই জায়গাটা গোস্বামী পাড়া, চলতি কথায় গোঁসাই পাড়া | এখানকার মানুষজন বৈষ্ণব, কৃষ্ণ উপাসক | এদের এক সময় ছোটখাট জমিদারীও ছিল | এখন নানাজন নানা পেশায় ছড়িয়ে পড়েছেন | এদের একটা অংশ হুগলী জেলার মাহিষ্য প্রধান গ্রামগুলিতে

গুরুগিরি করতেন | পরিবার ভাগ হলে যেমন সম্পত্তি ভাগ হয় তেমনি শরিকদের মধ্যে গ্রামগুলোও ভাগ হতে থাকে | ভাগ হতে হতে সদানন্দ বাবুর ভাগে এখন তারকেশ্বর লাইনের কিছু গ্রাম | উনি প্রতিমাসের প্রথমে বেরিয়ে যান | দিন কুড়ি বিভিন্ন যজমানের ঘরে ঘুরে তৃতীয় সপ্তাহে ফিরে আসেন | শিষ্যদের প্রণামীতেই একমাত্র ছেলেকে নিয়ে সদানন্দবাবুর সংসার চলে |

সদানন্দবাবু যেদিন বাড়ি ফেরেন সেদিন বাড়ির পরিবেশ একটু লঘুই থাকে | সন্ধ্যেবেলা তিনজনে মিলে বস্তা, ব্যাগ খুলে জিনিসপত্রগুলো দেখেন, গোছান | টাকাপয়সা হিসাব করে গুছিয়ে তুলে রাখেন | তারপর - অনেকদিন বাদে স্বামী ঘরে ফিরেছেন, নয়নতারা গুছিয়ে রান্না করেন, একসঙ্গে তিনজনে খেতে বসেন | আজ পরিস্থিতি একটু ভিন্ন | পর পর দুবার তারক ইন্টারমিডিয়েটে অকৃতকার্য হ'ল | প্রথমবারই ও বলতে শুরু করেছিল আর পড়বে না | সুতরাং ওর পড়াশুনায় যে এখানেই ইতি হয়ে গেল সেটা পরিষ্কার | তাই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদানন্দবাবু ইদানীং বেশ চিন্তিত থাকেন |

গ্রামে তারকের বন্ধু বিশেষ নেই বললেই চলে | কারণ সে একটু অন্যরকম | ধুতি-শার্ট-পরা তারক সমবয়সী সকলের থেকে আলাদা | ছেলেদের মধ্যে যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা, দুরন্তপনা থাকে তা তারকের কখনই ছিল না | সে একটা ভাল 'ভাল ছেলে' ভাব নিয়ে সকলের পিছু পিছু চলত | সকলে ওর পেছনে লাগত, ওকে নিয়ে মজা করত | ফলে ছেলে বয়সে যা হয় তারক হয়ে গেল সকলের পেছনে লাগার টারগেট | চান করতে গিয়ে যখন বন্ধুরা মাঝপুকুর তোলপাড় করছে, তখন তারক কোমরজলে কোন রকমে ডুব দিয়ে উঠে পড়ত | তারককে নিয়ে বন্ধুরা যখন হাসি-মজা করত সুমন তখন মধ্যস্থতা করত | তারকদা সরল হাসি হেসে সব মেনে নেয় | সুমনের সঙ্গে তারকদার এটাই ছিল বন্ধুত্বের কারণ | সুমন তারকের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট | কোনও অজানা কারণে সুমন তারকদাকে একটু সঙ্গ দেয় আর একটু রক্ষাও করে |

ইতিমধ্যে তারকের কলেজ যাওয়া বন্ধুরা আরও বড় হয়েছে | তারা ছাত্র-রাজনীতি শিখেছে, দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকা পড়ে | সে এক উত্তাল সময় | খাদ্য আন্দোলন, বামপন্থী রাজনীতি, যুক্তফ্রন্ট সরকার, নকশাল আন্দোলন | তারকদা সেই সময় সমবয়সী বন্ধুদের চেয়ে অনেক পেছিয়ে পড়ল | কয়েকটা নীচু ক্লাসের টিউশনি যোগাড় করে নিয়ে দিন কাটাতে লাগল | সদানন্দবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তারকের পড়াশুনা বিশেষ হবে না | হ'লও ঠিক তাই | ভালকরে লেখাপড়া করেও ছেলেরা ঠিকঠাক কাজ যোগাড় করতে পারছে না | তারক কী করবে? তাঁর মনে ইদানীং একটা ইচ্ছে দানা বাঁধছে | তারক যদি তাঁর কাজেই যোগ দেয়? কিন্তু সে যে শুনতেই চায় না! দিন পাল্টাচ্ছে, রাজনৈতিক বাতাবরণ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে |

মিছিল মিটিং ধর্মঘট লেগেই আছে | গ্রামের যুবক, শিক্ষিত সম্প্রদায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে নাম লেখাচ্ছে | সদানন্দবাবু আঁচ করেন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব আসছে | ব্রাহ্মণের সম্মান যেন আর আগের মতো নেই | তিনি নিজে একটা ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে বাস করেন | প্রায় প্রতিটি পরিবারই শিক্ষিত, চাকুরিজীবী | সবার বাড়িতে পুজোপাঠ হয় বটে কিন্তু ব্রাহ্মণের যে আলাদা সম্মান তা আলাদা করে বোঝা যায় না | গ্রামের কোন জমায়েতে উনি কথা বলার অযোগ্য হয়ে উঠেছেন | তাঁর জগৎ থেকে এই জগৎ কত আলাদা | উনি মাসের কুড়িদিন যাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসেন, সেখানে তিনি বক্তা আর সকলে শ্রোতা | সন্ধ্যায় হারিকেন হাতে মানুষজন আসে, তিনি রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের গল্প বলেন, মানুষ ভক্তিভরে শোনে, মান্য করে,

শ্রদ্ধা করে | সেখানে ইস্কুল তিন ক্রোশ দূরে | শহরে চাকরি করতে যাওয়া মানুষ হাতে গোনা | কাছাকাছি কলকারখানাও নেই যেখানে মানুষ কাজ করবে | মানুষের পেশা চাষবাস, ছোটখাট দোকান | দেড় মাইল হেঁটে গিয়ে বাস রাস্তা | কিছু মানুষ বাসের মাথায় চেপে শাকসব্জি নিয়ে গঞ্জে গিয়ে বিক্রি করে আসে | দুচারটে যা সম্পন্ন পরিবার ছিল তারা সব শহরে চলে গেছে | লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি বা ব্যবসা করে | ক্বচিৎ গ্রামে তাদের দেখা যায় | তাদের বড় বড় বাড়িগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে | সদানন্দবাবু বেশ বুঝতে পারেন দিন বদল হচ্ছে | নিজের গ্রামের হাওয়া এখানেও পৌঁছবে | এই কাজ বেশিদিন চলবে না | নিজের জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে | এই বয়সে নিজের ঘর ছেড়ে এক একদিন এক একজনের বাড়ি – যতই তারা যত্ন করুক, এ ধকল আর সয় না | এবার অবসর নিলেই হয় | কিন্তু ছেলেটা – তাকে একটু প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে... দিন বদল হচ্ছে বটে কিন্তু এখনও সময় আছে | ট্রেন লাইন, বাস রাস্তা থেকে বহুদূরের এই সব মাহিষ্য, চাষী-প্রধান গ্রামগুলোতে এখনও ব্রাহ্মণের সম্মান আছে, এখনও সেখানে কাজ করার সুযোগ আছে | নিজে থাকতে থাকতে তারককে নিয়ে একটা বছর যদি শিষ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত! মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় | বসে বসে সদানন্দবাবু এইসবই ভাবেন |

তারক বাবার কথা না শুনে একটা চাকরি জুটিয়ে নেয় | রোজ সকালে ট্রেনে করে কলকাতা, রাত্তিরে ফেরা | কোনও একটা ছোটখাট অফিসে কেরানির চাকরি | চাকরিটা করতে করতে তারক ধীরে ধীরে বুঝতে পারে বাস্তবটা | এ চাকরিতে তার জীবন কাটবে না | তাছাড়া ও বুঝতে পারে ভালকরে পড়াশুনা করে চাকরি করলে চাকুরিজীবী হয় আর ওর মতো চাকরি যারা করে তারা হয় চাকর | মালিক না চাইলেই চাকরি নেই | এদিকে বাবা ওকে বুঝিয়ে চলেন – ওরে ভুল করিসনে, আমার সঙ্গে কয়েক মাস চল, সকলের সঙ্গে পরিচয় কর | ভাল না লাগলে আবার চাকরি খুঁজে নিস |

সুমন মন দিয়ে তারকদার গল্প শোনে | এইরকম কাজ জ্যাঠামশাইয়ের! এখনকার দিনে এইরকম গুরুগিরি চলে? আবার এই কাজ করার জন্যে তারকদার ওপর চাপ! সুমন কল্পনাও করতে পারে না তারকদা একজন গুরুদেব | তারকদা পুজো করবে, মন্ত্র দেবে, লোকে এসে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করবে | জ্যাঠামশাইকে মানায়, তাই বলে তারকদা? বাগানে গাছতলায় বসে একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে তারক নিজের সমস্যার কথা, দোলাচলের কথা সুমনকে বলে |

শেষে একদিন তারক বাবার প্রস্তাবে মত দেয় | সদানন্দ তারককে নিয়ে শিষ্যদের বাড়ি ঘুরতে শুরু করেন | একসময় বুঝতে পারেন মানুষদের গুরুভক্তি এখনও অটুট | তারা স্নেহভরে তারককে গ্রহণ করছে বটে কিন্তু গুরু হিসাবে তারা সদানন্দকেই চায় | বুঝতে পারলেন উনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তাঁর ছায়া থেকে তারক বেরোতে পারবে না | এই সময়ে সদানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন | শিষ্যদের বাড়ি খবর গেলে তারা অনেকে দেখতে এল | দু'একজন ধনী শিষ্য গুরুদেবকে শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার কথাও বলল | কিন্ত সদানন্দ প্রশান্ত মুখে তাদের না বলে দিলেন | শেষ শয্যায় শুয়ে তিনি জেনে গেলেন যে শিষ্যরা তারককে গ্রহণ করেছে | তিনি পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজলেন |

কয়েক দিনের ছুটিতে বাড়ি এসে খবরটা শুনে সুমন গেল তারকদার বাড়ি | তারকদা বাবার ইচ্ছা মৃত্যুর গল্প শোনাল |

- বুঝলি, বাবা আমার জন্যে শেষে নিজের জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে গেল |

- সেকি! কেন?

- বাবার ধারণা ছিল বাবা যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ আমাকে ঠিকমতো গ্রহণ করবে না | আমি একদিন শুনলাম, বাবা মাকে বলছে – 'আমার এবার চলে যাওয়াই উচিত | তারককে প্রায় সকলের কাছেই নিয়ে গেছি | ও ভালই কথাবার্তা বলছে | কিন্তু আমি পাশে থাকলে ওর একটু অসুবিধে হচ্ছে | আর মানুষও ওকে ছেড়ে আমাকেই চাইছে |' মা বাবাকে বোঝাল – 'তোমার বয়স হয়েছে, তুমি বাড়িতে বিশ্রাম নাও | চলে যাবার কথা বলছ কেন? কিন্তু বাবার সেই এক কথা | এর পরেই তো বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ল |

সুমন বুঝতে পারল তারকদা বাবার ইচ্ছামৃত্যুর গল্পটা গভীরভাবে বিশ্বাস করে | নিয়তি মানুষকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যায় | ওর থেকে কয়েক বছর মাত্র বড় তারকদা – কেমন একজন গুরুদেব হয়ে উঠছে | ধীরে ধীরে তারকদার মুখটাই কেমন বদলে যাচ্ছে | চুলগুলো বড় হতে হতে ঘাড় অবধি নেমে গেছে | কপালে চন্দনের টিপ, বড় বড় চোখ | সুমন তারকদার প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে | এই অজানা জগতটা সম্পর্কে ওর ভীষণ কৌতূহল | তাই সুযোগ হলেই ও তারকদার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটায় |

জলে পড়লে মানুষ যেমন বাধ্য হয়ে হাত পা ছোঁড়ে এবং সাঁতার শিখে যায় তারকও তেমনি বাবার পরামর্শ মেনে নিজের জীবনযাত্রা, চালচলন বদলে ফেলে | ইদানীং পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া তার নিত্যদিনের কাজ | সুমন এলে তারক তাকে গল্প শোনায় – নিত্যানন্দ একদিন রাতে নগর ঘুরে নিমাইয়ের কাছে আসছিল | পথে জগাই মাধাইয়ের সাথে দেখা | কে রে? কে তুই? কী নাম তোর? নিত্যানন্দ নিজের নাম না বলে বললেন 'অবধূত' | জগাই মাধাই অবধূত-এর ব্যাখ্যা জানত না | কারণ অবধূত শুনেই মাধাই মদের মাটির মটকা ছুঁড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায় | মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল | মাধাই আবার মারতে লাগল | জগাই তাকে বাধা দিয়ে বলল, দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে মেরে কী লাভ? কেন মারলে?

ঘটনাটা লোকে দেখল | দেখেই দৌড়ে গিয়ে নিমাইকে গিয়ে খবর দিল | নিমাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এল | এসে দেখল নিত্যানন্দের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, কিন্তু তিনি হাসছেন | নিমাই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'চক্র - চক্র দাও আমাকে' |

চক্র এল কোথা থেকে, কেমন করে, সেকথা আলাদা | সবাই দেখল নিমাইয়ের হাতে চক্র | জগাই-মাধাইও দেখল | কিন্তু নিত্যানন্দ বললেন, 'মাধাই মেরেছে, জগাই রেখেছে | তুমি এ দুজনের প্রাণ ভিক্ষা দাও | আমার কোন কষ্ট নেই' |

নিমাই নিজেকে সংবরণ করল | দেখল জগাই মাধাই দুজনেই ভীত সন্ত্রস্ত | জগাইয়ের ওপর তাঁর মন প্রসন্ন হ'ল | সে জগাইকে আলিঙ্গন করল | জগাই সেই স্পর্শে মুহূর্তেই মূর্ছা গেল | নিমাই জগাইয়ের বুকের ওপর পা তুলে দিল | তারপর জগাই মাধাই দুজনেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে নিমাইকে দেখল | দেখে মাধাইয়েরও চিত্ত স্থির হ'ল | দুজনেই নিমাইয়ের পায়ে এসে পড়ল | নিমাই বলল, 'তোরা আর করিস না পাপ' |

জগাই-মাধাই বলল, 'আর না রে বাপ' |

জগাই মাধাইয়েরও অবতার দর্শন হ'ল | একেই বলে রূপান্তর |

তারক আবেশ নিয়ে পড়া শেষ করে | বই বন্ধ করে সুমনকে বলল – ভাল লাগল? সুমন ঘাড় নাড়ে | ওর যাত্রার আসরে দেখা গল্পটা মনে পড়ে যায় | অবতার টবতার বিষয়গুলো ওকে বিশেষ টানে না কিন্তু ও ভাবে তারকদা কি নিজেরও রূপান্তরের কথা ভাবছে? ও কিছুটা কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু তা প্রকাশ করে না | বন্ধুদেরও ও কিছু বলে না | তারকদাকে বন্ধুদের কাছে ঠাট্টার পাত্র করতে ওর মন চায় না | ও মাঝে মাঝে তারকদার সঙ্গে দেখা হলেই বলে – 'তারকদা তোমার গল্প বলো | কেমন কাটাও তুমি শিষ্যদের সঙ্গে |'

- তারকেশ্বর এলাকায় আমাদের অনেক শিষ্য | তুই বিশ্বাস করবি না – যাবার সঙ্গে সঙ্গে পা ধোয়ার জল, বাবার বয়সী লোকেরা সব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, সঙ্গে প্রণামী | নতুন গামছা, সাবান, টুথপেস্ট, ব্রাশ | পরিষ্কার বিছানা, কাঁসার থালায় নিরামিষ খাবার | একজন শিষ্যর বাড়ি বিকেলে গেলাম, পরের দিন ভাত খেয়ে বিকেলে আরেক জনের বাড়ি | সেখানেও একই ব্যবস্থা | আর যা বলব তা যদি লেগে গেল তা হলে তো কথাই নেই |

- কী রকম বলো তুমি? তুমি শিষ্যদের কী উপদেশ দাও?

খুব সহজ | বাবা বলত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কাহিনীগুলো ভাল করে পড়তে, এর মধ্যেই সব সৎ উপদেশ লুকিয়ে আছে | মানুষের যে কোন সমস্যার সমাধান পুরাণের গল্প দিয়ে করা যায় | গ্রাম চাষীপ্রধান এলাকা; সরল, সাদাসিধে

লোকজন, গল্প বলে বোঝালে তাদের ভেতর অবধি পৌঁছায় | সন্ধ্যেবেলা প্রত্যেক বাড়িতে আসর বসে | পাড়ার লোকজনও হাজির থাকে | ফলে রোজগারও ভালই হয় | তুই বিশ্বাস করবি না, যা মুখ দিয়ে বলি, লেগে যায় |

সুমন অবাক হয় | – বলো কী তারকদা? তুমি যা বলো লেগে যায়?

- আরে আমি কি অসম্ভব কিছু বলি নাকি? যা হওয়া সম্ভব আমি তো তাই বলি | একটা ছেলে কিছুতেই স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারছে না | বাবা মা কেঁদে কেঁদে একই কথা বলে | আমি তো তাদের বলি না তোমাদের ছেলে বিএ-এমএ পাশ করবে | আমি বললাম দেখো তোমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসছে | ছেলেটাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে ইলেক্ট্রিশিয়ানের ট্রেনিং নিতে পাঠাও | তারপর বাড়ির সামনে একটা দোকান দাও | ওর কাজের অভাব হবে না | তোকে বলব কি সুমন, ছেলেটা আমার মান রেখেছে | ভাল মিস্ত্রী হয়েছে | কাজ শেষ করে উঠতে পারে না | আমি ওকে বলেছি মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবি আর ঠিকঠাক পয়সা নিবি | সেই দোকান এখন জমে গেছে | এইবার বুঝতে পারছিস আমার খাতিরটা? একজনের বাচ্চা হচ্ছে না, অনেক দিন ধরে চিকিৎসা চলছে, কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না | আমি কি করব বল তো? একদিন ভাল করে পুজোপাঠ করে আমার গোপালের কাছে প্রার্থনা করলাম, আর বলে ফেললাম 'হবে, হবে | ছেলে হবে |' আর হবি তো হ ছেলেই হ'ল | আর যায় কোথায়!

আমার এক শিষ্য বৃন্দাবন – অবস্থা বেশ ভাল | ছেলেরা বড় হয়েছে | ঠিকঠাক চাকরি হচ্ছে না | তাঁর স্ত্রী মায়া আমাকে প্রায়ই বলত, ছেলেদের কী হবে? তারা কী করবে? ঠাকুর মশাই আপনি একটা পথ বলে দিন... | আমি কী বলব বল তো? এরা আমাকে কী ভাবে? আমার নিজের পথই আমি জানতাম না | আমি চাইনি তবু অদৃষ্ট আমাকে এই পথে টেনে নিয়ে এসেছিল | আমি এদের পথ দেখাব কীভাবে?

- ঠাকুর, আপনি যা বলবেন – তাই হবে | আপনি এদের পথ দেখান | ঘরে তিন তিনটে জোয়ান ছেলে, দুদিন পরে এদের সংসার হবে | আমাদের যেটুকু জমি তা ভাগ হলে এদের ভাগে যেটুকু পড়বে তাতে এদের পেট ভরবে না |

নিজেকে অসহায় মনে হতো | ভাবতাম কীভাবে আমি মানুষের প্রত্যাশার জালে জড়িয়ে পড়ছি | আবার কখনও কখনও ভাবতাম বাবা তো আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন | আর এরা তো আমাকে বাবার জায়গায় স্থান দিয়েছে | এদের অর্থেই আমার অন্ন | আমারও তো কিছু ফিরিয়ে দেওয়া শোভন | বৃন্দাবনের স্ত্রীর মধ্যে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে, এমন গৃহিণী সংসারে থাকলে সংসার উপচে ওঠে | একদিন বৃন্দাবনকে ডেকে বললাম, তোমাদের ঐ চৌমাথার চতুর্দিকে অনেকগুলো গ্রাম | ভবিষ্যতে ঐটা ব্যবসার খুব ভাল জায়গা হয়ে উঠবে | তুমি ছেলেকে একটা মুদিখানা কাম স্টেশনারী দোকান করে দাও | দোকানের নাম কিন্তু হবে তোমার স্ত্রীর নামে, মায়া স্টোর্স | সেই দোকান ভাল চলতে লাগল | আর এদের ভাল হলেই তো আমারও ভাল |

জিজ্ঞেস করি, – তারকদা, বয়স্ক মানুষদের প্রণাম নিতে খারাপ লাগে না?

- প্রথম প্রথম লাগত | নিতে চাইতাম না | বাবা বোঝাল প্রণাম না নিলে শিষ্যদের বঞ্চিত করা হয়, তারা দুঃখ পায় | এখন অভ্যাস হয়ে গেছে | একদিন কি হয়েছে শোন – গয়লাবাড়ির একটি বউ একটা সরা করে দুধ নিয়ে এসে বলে পায়ের বুড়ো আঙুলটা দুধে ডুবিয়ে দিতে | আমি অবাক | বলে কিনা ওর বৌমার কী একটা ব্রত আছে | তাতে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পান করতে হয় | আমি তখন নতুন; কিছুতেই রাজি হই না | ওরা বলে বড় ঠাকুর তো কখনও না বলতেন না | আমি ওদের বোঝালাম, আগেকার দিনে অত রোগ-বীজাণু তো ছিল না | এখন রাস্তার ধুলোয় কত নোংরা, আমি ঐ পাত্রের দুধে হাতের আঙুলটা ঠেকিয়ে দিচ্ছি | ওতেই হবে | ওরা কিছুতেই রাজী হবে না, আমি জোর করে এই নিয়ম চালু করেছি |

সুমন এই সব গল্প অবাক হয়ে শোনে – তারকদা একটা কথা বলি?

- বল |

- তারকদা, গুরুদেবরা শুনি অনেক খারাপ খারাপ কাজ করে | তুমি কিছু করো না তো?

- তোর কি মনে হয় সুমন, আমি খারাপ কাজ করতে পারি?

- না না | সেই জন্যেই তো সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারলাম |

ইতিমধ্যে তারক সংসারী হয় | সুমনও বদলির চাকরি নিয়ে দূরে চলে যায় | বাড়ি আসা ধীরে ধীরে কমে আসে | তারকদার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও অনিয়মিত হয়ে যায় | তবু সেই তরুণ বয়সের সখ্যতাটা থেকে যায় | দেখা হলে ওরা দুদন্ড বসে | সুমন তারকদার গল্প শুনতে চায়, ও এখনও মজা পায় ঐসব গল্পে | যেন অন্য এক জগতের গল্প | কিন্তু সময় বয়ে যায়, সমাজ বদলে যায় | তারকেশ্বরের কাছের সেই মাহিষ্য অধ্যুষিত

গ্রামগুলোও বদলায়। গ্রামগুলোর বুক চিরে চওড়া পিচঢালা রাস্তা তৈরী হয়েছে। একদিকে শেয়ার বাজার হয়ে বর্ধমান, অন্যদিকে তারকেশ্বর, আরামবাগের রাস্তা। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে শেওড়াফুলি হয়ে কলকাতা যাওয়া এখন সহজ। স্কুল কলেজ এখন আর দূরের জিনিস নয়। ঘরে ঘরে ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়ছে, শহরে যাচ্ছে চাকরি করতে। বড় রাস্তার ধারে হিমঘর হয়েছে। চাষীরা তাদের ফসল সেখানে মজুত রাখে। সুসময়ে বিক্রী করে কিছু বাড়তি পয়সা পায়। গ্রামে মাটির বাড়ি আজকাল আর নেই বললেই চলে। বিদ্যুতের আলো এসে শুধু রাতের অন্ধকার নয় মানুষের মনের অন্ধকারও দূর করছে।

পরিবার ছোট হয়ে গেছে। দারিদ্র, অভাব থাকলেও এখন তা ভাত কাপড়ের নয়। তারকনাথের চোখের সামনে ধীরে ধীরে এই সব পরিবর্তনগুলো ঘটে যায়। নতুন শতাব্দীতে এখন গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর অফিস। পঞ্চায়েতের সদস্যদের হাতে এখন অনেক অর্থ, অনেক ক্ষমতা। রাজনৈতিক দলাদলির পরিণতিতে হিংসা এখন নিত্যকার ঘটনা। মানুষের যুক্তি দিয়ে কথা বলার প্রয়াস, দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার প্রবণতা। এ সবের মধ্যে দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে। তারকনাথ মাঝে মাঝে ভাবেন বাবার আমল থেকে আজকের এই দিন – কত পরিবর্তন। শিষ্যদের বাড়িতে যখন তারকনাথ থাকেন তখন সেই শতাব্দী প্রাচীন বিশ্বাসের সমাজ। কিন্তু বাইরে বেরোলেই অন্য পৃথিবী। তারকনাথ ভাবেন কেন মানুষ তাকে এখনও সহ্য করে চলেছে। তিনি তাদের বিনিময়ে কী দেন বা দিতে পারেন। মাঝে মাঝে তরুণ প্রজন্মের কিছু কিছু মন্তব্য কানে আসে। হতাশা গ্রাস করে মাঝে মাঝে, ভাবেন এই কাজ আর নয়। কিন্তু ছাড়তে পারেন না। এ যেন একটা নেশা। টাকার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক অভিনেতা যেমন আলোকিত মঞ্চ দাপিয়ে অভিনয় করে নাটক শেষে হাত জোড় করে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাদনের লোভে, রাজনৈতিক নেতা যেমন অশক্ত শরীরে মঞ্চে উঠে লক্ষ লোকের মনে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে চায় তেমনি একজন গুরুদেবও চান নতজানু শিষ্যকে, যে তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করবে, আর তিনি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে নিজেও তৃপ্ত হবেন। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু সব পথেরই শেষ আছে। সব চলারই থামা আছে। তারকনাথও একদিন থেমে পড়েন।

বেশ কিছুদিন ধরেই তারকনাথ বুঝতে পারছিলেন যে কোথাও ছন্দপতন হচ্ছে। গুরুদেবের আশীর্বাদ আর মানুষের তেমন প্রয়োজন হচ্ছে না। ছেলেমেয়ের বিয়ের পাকা কথার আগে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করা হত। আজকাল সব হয়ে যাবার পর তাঁকে খবর দেওয়া হচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা জপ-আহ্নিক সেরে শাস্ত্রপাঠ বা পুরাণের গল্প শোনার চেয়ে তাদের টিভি সিরিয়ালেই বেশি আগ্রহ। যে বাড়িতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নেই সেখানে শ্রদ্ধা ভক্তিতেও কেমন যেন ঢিলে ভাব এসে গেছে। দীর্ঘদিনের প্রথা থেকে সামান্য বিচ্যুতিকেই অসম্মানজনক বলে মনে হয়। কিন্তু আরও বড় আঘাত এল এক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ থেকে; তাদের প্রতিনিধি গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে শিষ্য সংগ্রহ করছিল। প্রতি মাসে সামান্য অর্থ আলাদা করে রাখতে হয় সঙ্ঘের জন্য। সেই অর্থ প্রতিনিধিরা সময়মতো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। গ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসবের আয়োজন করা হয়। সুন্দর করে মঞ্চ সাজানো হয়। ভক্তিসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই উৎসবে তাদের মূল আশ্রম থেকে গুরুদেব আসেন। তিনি অমৃত কথা শোনান। দুপুরে সকলে মিলে পঙক্তি ভোজন হয়।

তারকনাথ খবর পান যে তাঁর শিষ্যরাও ওই অনুষ্ঠানে যাতায়াত করে। তাঁর কয়েকটা গ্রামে যত শিষ্য তাতে প্রত্যেক বাড়িতে একদিন করে যেতেই বছর ঘুরে যায়। সে রকমই চলছিল। তাকে আসতে কেউ বারণ করে না। কিন্তু কেমন যেন একটা দ্বিধা মাঝে মাঝেই ওকে পীড়া দেয়। প্রতিবার বাড়ি ফেরার সময় সিদ্ধান্ত নেন যে আর নয়। শুধু মন নয়, শরীরও আজকাল আর সাথে থাকছে না। রাতে শুয়ে মালতীকে বলেন সব কথা। মালতী বোঝায় স্বামীকে – 'তোমার আর কী দরকার? চাকরি করলে তো কবেই অবসর নিয়ে নিতে। একমাত্র মেয়েকে সৎপাত্রে দেওয়া হয়েছে। যা আছে তাতে তো আমাদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।' তারকনাথ মেনে নেন, কিন্তু যেই মাস শেষ হয় ওঁর মনে একটা ছটফটানি আসে, দু'একদিন পরেই ব্যাগ গোছাতে বসে যান।

হেমন্তের বিকেল। বড় রাস্তার মোড়ে তারকনাথ বাস থেকে নেমে একটু দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনও পরিচিত মুখ খুঁজলেন। তারপর গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। দামোদরের দক্ষিণ পার থেকে হুগলী জেলার এই অঞ্চলটায় সুগন্ধী ধানের ব্যাপক চাষ হয়। সকলের উঠোনেই সুগন্ধী ধানের গোলা। দাম চড়লে চাষীরা ধান বিক্রী করে। এখন মাঠভর্তি পাকা ধান। আকাশে বাতাসে সেই সুগন্ধ। তারকনাথ

বুক ভরে শ্বাস নেন। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা চৌমাথায় পৌঁছে মায়া স্টোর্সের সামনে এসে একটু দাঁড়ালেন। এই দোকানটার নাম তাঁর নিজের দেওয়া। বৃন্দাবন দাস তখন জীবিত।

ঐ একটা দোকান থেকে এখন তিনটে দোকান। মায়া মেডিকেল স্টোর্স, মায়া মিষ্টান্ন ভান্ডার। এখন তিন ছেলের তিনটে দোকান, তিনজনের আলাদা আলাদা বাড়ি। প্রত্যেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারকনাথকে দেখে গৌর বেরিয়ে এসে প্রণাম করে।

- ঠাকুরমশাই আজই এলেন?

- হ্যাঁ এই তো আসছি।

- চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

গৌর গুরুদেবকে পেছনে বসিয়ে মোটরসাইকেল স্টার্ট দেয়।

ঠাকুরমশাই, ইস্কুলের মাঠে বিরাট প্যান্ডেল হয়েছে। ঠাকুর যুগল কিশোরের প্রবচন চলছে রোজ সন্ধ্যেয়। ঠাকুর নিজে এসেছেন। সন্ধ্যে থেকে সবাই ব্যস্ত।

- তাই নাকি? ভালই তো। ভাল ভাল কথা শোনা হবে।

হ্যাঁ, তা বটে। তবে আমাদের তো সময় হয় না। বাড়ির মেয়েরা সব যাবে।

তারকনাথ একটু অস্বস্তিতে পড়েন। ওদের বাড়ি গিয়ে উঠবেন, অথচ ওরাই অন্য জায়গায় ব্যস্ত। গৌর বাড়ির দরজায় তারকনাথকে নামিয়ে দোকানে ফিরে যায়।

বৃন্দাবনের সাবেক বাড়ি এখন তিন ভাগ হয়ে গেছে। পাশাপাশি লাগোয়া তিনটি বাড়ি। তারা পৃথক কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখেছে। মনে পড়ে এই বাড়ি ভাগ হওয়ার সময় তারকনাথকে সামান্য মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল। বৃন্দাবন তাঁর নিজের ইচ্ছের কথা গুরুদেবকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল। তারপর সকলকে ডেকে একদিন গুরুদেবের উপস্থিতিতে ভাগাভাগি করে দেন। উনি এখনও সেই মূল বাড়িটিতেই ওঠেন। ওটি এখন বড় ছেলে, গৌরের ভাগে।

বাড়িতে প্রবেশের পর তারকনাথের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হয় না। কিন্তু জানা গেল গ্রামে এখন যেন উৎসব চলছে। গ্রামের প্রায় সব পুরুষ, মহিলা সন্ধ্যের পর গিয়ে হাজির হচ্ছে প্রবচনের মাঠে। সেখানে কীর্তন, ভজন ইত্যাদির পর ধর্মকথা আলোচনা হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে ঠাকুরের মূল আশ্রমে বিরাট মেলা হবে, সেখানে শিষ্যদের থাকা খাওয়ার বিপুল আয়োজন থাকবে। গ্রামের বহু মানুষ দলে দলে শিষ্য হচ্ছে। তারকনাথের অনুমতি নিয়ে বাড়ির মেয়েরা সব বেরিয়ে বেরিয়ে গেল। তারকনাথ একা বসে বসে ভাবতে লাগলেন কীভাবে ছোট ছোট উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণকার মণিকাররা নিজেদের দোকান তুলে দিয়ে বড় বড় দোকানে কাজ নিচ্ছে। মানুষ এখন বড় বড় দোকানে গহনা কিনতে চায়। আজকাল চাষেও বড় বড় কম্পানি এসে যাচ্ছে। বীজ, সার, যন্ত্রপাতি তারা দেবে, তাদের ইচ্ছেমতো চাষ করতে হবে। তারা সব ফসল কিনে নেবে। এমনকি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও তারা দায় নেবে। চাষীরা ধীরে ধীরে চুক্তি চাষে রাজি হওয়ার কথা ভাবছে।

এইসবের সঙ্গে তারকনাথ নিজের পেশার মিল খুঁজে পায়। সন্ধ্যের পর বেশ একটা শীত শীত ভাব। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে তারকনাথ বেরিয়ে পড়েন। মাইকের শব্দ শুনে, আকাশে আলোর আভাসকে লক্ষ্য করে তারকনাথ এগিয়ে চলেন। মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে মাথাটাকে ভাল করে ঢেকে নেন। কেউ যেন না চেনে। প্যান্ডেলে ঢুকে শেষ সারিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আলোকিত মঞ্চে রাধাকৃষ্ণের বিশাল প্রতিকৃতি, পাশেই গুরুদেবের উজ্জ্বল ছবি। সুন্দর উজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত ছেলে মেয়েরা সুললিত কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের গান গাইছে, সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গ। এক সময় মঞ্চের ঠিক পাশে এসে একটা গাড়ি দাঁড়াল। সেখান থেকে নেমে দ্রুত পায়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন যুগলকিশোর মহারাজ। সত্যিই মহারাজ, ঝলমলে গেরুয়া রঙের সিল্কের পোশাক। গায়ে উত্তরীয়, গলায় মালা। মঞ্চে প্রবেশ করে তিনি গানে গলা মেলালেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য সব কণ্ঠ মিলিয়ে গেল। মঞ্চে শুধু গুরুদেবের উজ্জ্বল উপস্থিতি। কয়েকটি সুন্দর গানের পর গুরুদেব সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। আজ শুরু করলেন গোবর্ধন পর্বতের কাহিনী। কীভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে লড়াইতে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে।

তারকনাথ মুগ্ধ হয়ে শুনছেন, শুনতে শুনতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন এক স্বেচ্ছাসেবকের কথায়।

- রাধেকৃষ্ণ! দাঁড়িয়ে কেন? আসুন অনেক আসন আছে।

তারকনাথ ইতস্তত করেন। স্বেচ্ছাসেবক একটা ফর্ম ওঁর হাতে দিয়ে বলল উল্টোদিকে নিয়মাবলী সব ছাপা আছে। যদি ঠাকুর টানেন তবে কাল আসবেন আমাদের কাউন্টারে ফর্মটা ভরে নিয়ে। সারা বছর আমাদের অনেক অনুষ্ঠান, অনেক আনন্দ। গুরুদেব সকল নতুন শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হবেন শেষদিন,

সকলকে স্পর্শ করবেন | গুরুদবের আশীর্বাদে আপনার জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হবে | রাধেকৃষ্ণ!

তারকনাথ 'ঠিক আছে' বলে পাশ কাটিয়ে সকলে ফেরার আগেই ঘরে ফিরে এলেন | রাতে আহারের পর নিজের ঘরে গিয়ে পূবের জানলাটা খুলে দিলেন | কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, পূব আকাশে চাঁদ; চাঁদের আলো জনলা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে লুটোচ্ছে সঙ্গে শীতের হিমেল হাওয়া | আজ আর ঘুম এল না | শয্যায় বসে বসে ভাবতে লাগলেন পুরনো কথা | দিন বদলের কথা | কত মানুষ, কত ভালবাসা, কত স্মৃতি | মধ্য রাত্রে খেয়াল করলেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে চরাচর | এও এক রূপ | কুয়াশা ভেদ করা হালকা চাঁদের আলোয় রহস্যময় চারদিক | তারকনাথ উঠে সব জানলাগুলো খুলে দেন | দৃষ্টি পথ হারায় অস্পষ্টতার মায়ায় | পরিচিত দৃশ্যগুলো যেন নতুন লাগে | এক সময় বসে বসেই তন্দ্রায় ঢলে পড়েন | শেষরাতে চাঁদ যখন পশ্চিমে ঢলেছে হঠাৎ স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পান | – 'আর কেন? সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এখন অর্থ, যশ, মান সব অর্থহীন | সব এখন বোঝা | একমাত্র সত্যি নিজ গৃহ, স্বজনঘেরা সংসার | গৃহকোণে পরিপূর্ণ বিশ্রাম |'

ভোর হয়ে আসছে | তারকনাথ নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নেন | নিঃশব্দে দরজা খুলে নিচে নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন | ছিপছিপে লম্বা এক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যান | সেই সঙ্গে মিলিয়ে যায় প্রাচীন এক প্রথা যা বাংলার গ্রামে গ্রামে সচল ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে |...

পত্নীগৃহে যাত্রা

শুভা আঢ্য

কী ভাবছেন? Typo, না ছাপার ভুল? পতিগৃহে যাত্রাই তো আজন্ম শুনে অভ্যস্ত, পত্নীগৃহে আবার কে কবে যাত্রা করে? নাঃ, ছাপাটা ঠিকই আছে, কথাটা 'পতি' নয়, 'পত্নী'ই বটে! কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে গল্পটা শুনুন |

"দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে এখুনি, নিয়ে যাবে তখুনি |"

ছড়াটি সুপরিচিত, তাই সব্বাই শুনেছে, তবে এর বদলে, কেউ শুনেছে কি?...

"দোল দোল দুলুনি, রাঙা মাথায় চিরুনি |
বৌ আসবে এখুনি, নিয়ে যাবে তখুনি |"

...শোনেনি তো? সেটাই স্বাভাবিক | কারণ কোনও খোকাবাবুকে এমন সৃষ্টিছাড়া ছড়া কেই বা শোনাবে?

তবে বাংলার হরেক খুকুমণি শৈশবে ঠাম্মা, দিদু বা নিদেন পক্ষে মায়ের কোলে বসে দুলতে দুলতে শুনেছে যে ভাবীকালে, এক শুভ লগনে অগোছালো রাঙা মাথাটিতে চিরুনি বুলিয়ে, সেজেগুজে, তাকে পতিগৃহে যেতে হবে | বাল্মিকীর সীতা থেকে কালীদাসের শকুন্তলা, বালিগঞ্জের বনানী থেকে চুঁচড়োর চপলারানী পর্যন্ত সব্বাই তাই করেছে, করছে ও করবে | এই যাত্রাটি ঘিরে রচিত হয়েছে কত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, মধুর ও করুণ রসে অভিষিক্ত, হাসিতে উজ্জ্বল, কান্নায় ছলছল কত রচনা! এটাই নিয়ম, এটাই রীতি – লক্ষ্মী মেয়েরা সানন্দে এই রীতি মেনে চলেছে | তবে সব নিয়মেরই তো ব্যতিক্রম আছে, আর সব মেয়েরাও লক্ষ্মী হয় না | আমার গল্পের শুরু সেই বিষয় নিয়েই |

জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কে আমার আবির্ভাব এক বাঙালি পরিবারে শিশুকন্যা রূপে | সে তো আমার মনে থাকার কথা নয়, তবে কিছুটা বড় হওয়ার পর পারিবারিক সংলাপ কানে এসেছে, দিদুর কোলে বসে চাঁদমামাকে ডাকাডাকি করবার সঙ্গে সঙ্গে দোল দোল ছড়াটিতে কচি হাতে তালি দিয়ে 'বর আসা ও নিয়ে যাওয়া' ইত্যাদিতে উৎসাহ প্রদর্শন করাতে আমার সায়ও ছিল | যেমনটি হওয়া উচিত | কিন্তু ভবিষ্যতে এই ঘিলু ধোওয়া ওরফে 'brain washing'-টা কোনো কাজে এল না | শিশুকাল পার হতে না হতেই 'লক্ষ্মী মেয়ে' হওয়া যে আমার ধাতে নেই

সে কথাটা জানতে কারো বাকি রইল না | পুতুল খেলার চেয়ে গাছে গাছে বিচরণ করার উৎসাহ ছিল বেশি | পড়ার বইতে মনোযোগ দেওয়ার থেকে স্কুলের অধ্যাপক/অধ্যাপিকার ডেস্কের নিচে বেড়াল ছানা লুকিয়ে রেখে তাঁদের আতঙ্ক উৎপাদন করার আগ্রহ ছিল প্রবল | বাড়ির শাসন, স্কুলে অধ্যাপক/অধ্যাপিকা কুলের বকুনি, প্রিন্সিপালের ঘরে নিয়মিত যাতায়াত, কোনোটাই তেমন কাজে লাগল না | গুরুজনরা দিয়েছিলেন মাথায় হাত! পাড়ার লোক সামনে বলত, 'দস্যি', 'দুরন্ত', পিছনে, 'গেছো'! আমাকে নিয়ে ঘরে-বাইরে সব সময় একটা আলোড়ন লেগেই থাকত; তবে সে নিয়ে আমার 'সদা-অধীর-তরঙ্গিত' জীবনে বিশেষ কোনো বাধা সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমার মনে নেই | ঠাম্মা ভবিষ্যৎ বাণী করে দিয়েছিলেন, 'এই দস্যি মেয়ের বর এ দেশে জুটবে না'! (জনান্তিকে বলে রাখি, সত্যিই জোটেনি | বরবাবু বহাল তবিয়তে সুদূর বিদেশে "তোমা লাগি আঁখি জাগে" মনে করে অপেক্ষা করছিলেন | ঠাম্মার ভবিষ্যৎ বাণী ফলেছিল অক্ষরে অক্ষরে!)

"নিয়ম-রীতি, করতে-হয়, সব্বাই করে", এই পর্যায়ের সব কিছুর সঙ্গে আমার জন্মগত বিরোধ ছিল আর এই ধরনের বস্তাপচা ধারণাগুলো আমাকে অবিরত চ্যালেঞ্জ করত | কাজেই, বর নিতে এলেই তার নির্দেশ মেনে নিয়ে সুড়সুড় করে তার পেছন পেছন যেতে হবে – এই নিয়মের বাঁধনটা স্বভাবতঃই আমার মনে বিরোধ উৎপাদন করত | আর সেটা মানতে হলে আমার মাথা কাটা যাবে, এমনই একটা মনোভাব নিয়ে কৈশোর বয়সে 'দূর, যাবই না শ্বশুরবাড়ি, দেখি কে নিয়ে যায়', সদম্ভে এই সব উক্তি করে আত্মীয় পরিজনকে বিরক্ত ও চিন্তান্বিত করেছি | আর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে গিয়ে, প্রফেসরের অনুপস্থিতির সদ্ব্যবহার করে – "যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী |" এইসব গরম গরম বুলি ঝেড়ে আমার মতো দু-চারটে সৃষ্টিছাড়া মেয়ের হাততালি ও পাড়াতুতো দাদাদের সঙ্গে প্রেম করা ন্যাকা চূড়ামণি মেয়েগুলোর বিরক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি | তারপর বোধহয় চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিতে, নানা সাবধান বাণী নস্যাৎ করে ও কারো কথায় কর্ণপাত না করে একলা পাড়ি দিয়েছি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে নিউ ইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে |

"এলেম নতুন দেশে"| মনে রাখবেন, ৭০ দশকের আমেরিকায় পথেঘাটে হুদো হুদো ভারতীয় দেখা যেত না | শাড়ী তো নয়ই | আর তখন ভারতবর্ষে টেলিভিশনও বিরল ছিল, কাজেই আমেরিকার সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও অতি সীমিত ছিল | দু-চারটে ইংরেজি ছবির মাধ্যমে আমেরিকা সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্যই সম্বল! আজব দেশ, আজব রীতি | নিউ ইয়র্ক বিশাল মহানগরী | নিরন্তর জনতার ব্যস্ত মিছিল, কোথায় যে চলেছে কে জানে! এত লোকের মাঝে আমি নিতান্তই একা | কেউ চেনে না, একবার শুধোয়ও না, 'কেমন আছ'? 'কী খবর'? পড়ার সঙ্গীরাও কেউ এই ছ'গজ কাপড় জড়ানো মূর্তি দেখতে অভ্যস্ত নয় | কেউ জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের দেশে কি হাতি ছাড়া আর কোনো যান বাহন আছে'? আর এক জ্ঞানী জানতে চায় "রোপ-ট্রিক"-এর কৌশল জানি কিনা | গায়ের রং দেখে প্রশ্ন করে, 'ট্যান হতে কত খরচ হয়েছে?' বুঝে উঠতে পারি না, হাসব না কাঁদব!

দিনরাত্তির মন-খারাপের ঠেলায় পড়াশোনা মাথায় ওঠার জোগাড় | লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের কাছে স্বীকার করতেই হ'ল একা থাকা অত সহজ নয় | মাঝ দরিয়ায় নোঙ্গর ছেঁড়া তরীটির মতো যতই ঢেউয়ের ঝাপট খাই ততই মনে হয়, কুল কোথায় পাই? পেলাম কুল | আলাপ হ'ল সেই সজ্জনের সঙ্গে, যিনি শক্ত হাতে হাল ধরে হলেন আমার ঘাটে ঘাটে ঘুরপাক খাওয়া, প্রায় ডুবন্ত তরণীর কর্ণধার | জীবনে এই প্রথম মনে হতে লাগল কারো হাতে হাত রেখে কোথাও যাওয়ার মধ্যে ভাল কিছু থাকলেও থাকতে পারে | ঐতিহ্যগত নিয়ম মানার আপত্তিটা আমার দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত কোথায় হারিয়েই গেল |

'বন্ধুবর' থেকে 'বর' হওয়া পর্বের অবান্তর বিবরণ আপনাদের জেনে কাজ নেই, তাই তার পরের অধ্যায়ের কথা বলছি | একা থেকে দোকা হওয়ার বাসনা দৃঢ় হওয়ার প্রয়োজন পড়ল – ধরণীর এক কোণে ছোট একটি বাসা রচনার | ধরণী তো ছিলই, আর একটি কোণও না হয় খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু আটকে গেল ওই 'বাসায়' এসে | আমেরিকা বিত্তশালী দেশ, তবে এদেশে নিম্নবিত্ত যে নেই তা তো নয় | তবে দেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অতি সামান্য সংস্থান, "সবার পিছে সবার নিচে", বললে খুব একটা অসত্য বলা হবে না | ইউনিভার্সিটির কল্যাণে আমাদের যুগল আয়ের ক্ষুদ্র পুঁজি সম্বল করে নিউ ইয়র্ক শহরে

সুবিধে মতো বাসস্থানের আশা করা আর আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে আনার দুঃসাহসিক প্রয়াস প্রায় একই |

আমার হবু বরটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট নামক একটি অপরিসর, প্রায়ান্ধকার কোটরে তাঁর পর্বতপ্রমাণ বই-খাতা, কাগজ-পত্র ও রাশি রাশি আরশোলার সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় অধিষ্ঠান করছিলেন | তার মধ্যে আমার পুঁজি-পাতি-সহ স্থান হওয়ার সম্ভাবনা ও স্বস্তির ব্যাপারে (প্রথম প্রেমের আবেশ থাকা সত্ত্বেও) আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল | আর একটি উপায় ছিল Married Students অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের আর্জি পেশ করা | তার waiting list দেখে সৈয়দ মুস্তাফা আলীর জবানীতে বলতে হয়েছিল – "সে গুড়ে পাথর"! এখন উপায়?

উপায় একটা ছিল, কিন্তু সেখানে রীতির ব্যতিক্রম | উপায় – আমার ছোট্ট, elevator-বিহীন, পাঁচ তলায় walk-up অ্যাপার্টমেন্টে তেনার স্থানান্তরিত হওয়া | ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও, সুশৃঙ্খলতার দরুন ও আরশোলার অনুপস্থিতিতে স্থানাভাব ততটা ছিল না | কী বিপর্যয়, বলুন তো? এতদিন পরে যখন আমি আমার চিরকালের বিশ্বাস-টিশ্বাস শিকেয় তুলে রেখে "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা" মনোভাব স্থির করে ফেলে যেখানে খুশি যেতে প্রস্তুত, তখন যাবার জায়গা নেই! একেই কি বলে বিধির বিড়ম্বনা? তাছাড়া, সখাটিও যখন সেই বাঙলারই সন্তান, তখন "দোল দোল" ছড়াটি অবশ্যই বাল্যকাল থেকে তিনিও শুনে এসেছেন! "নিয়ে যাবার" জন্যই তাঁর প্রস্তুত থাকার কথা, বৌ-এর অঞ্চল সম্বল করে গুটিগুটি তার ঘরে যেতে নিশ্চয়ই নয়! যাইহোক, চিন্তা করবেন না, এ গল্পের সমাপ্তি মধুর |

কয়েকটি বিনিদ্র নিশি-যাপন করার পর, শেষকালে আমতা আমতা করে তাঁর দরবারে নিবেদন করলাম আমার সমস্যার সমাধান | সেইদিন বুঝলাম, আমার হৃদি-রঞ্জনটি আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক মানুষ, 'হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস নন'! তিনি অলীক কল্পনার জগতে নয় বাস্তব জগতে বিচরণ করেন | সবকিছু আগাপাছতলা বিচার করে রায় দিলেন, facts are facts – যেতে যখন হবে, আর যাবার জায়গা যখন একটিই, তখন তিনিই করবেন পত্নীগৃহে যাত্রা | এ নিয়ে আর ভাবাভাবির কিছু কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না | এই সহজ উপায় থাকতে, তা নিয়ে আমার অশান্ত জীবন যাপনের কথাটা তাঁর কিছুতেই বোধগম্য হ'ল না |

শুভদিনে তাঁর আগমন হ'ল | সঙ্গে এল বই-খাতা-কাগজ-পত্র আর অবশ্যই কিছু আরশোলাও | তাঁকে বললাম – "এস এস পুরুষোত্তম, এস বীর মম"| প্রত্যুত্তরে, তিনি বীরোচিত, থুড়ি, বরোচিত গাম্ভীর্যে নরম সোফায় গ্যাঁট হয়ে বসে বললেন, 'একটু চা খেলে হতো না'? আর চায়ের খোঁজে ইতিউতি তাকাতে লাগলেন | শুরু হ'ল আমাদের যুগল যাত্রা |

একটা কথা কিন্তু না বলে শেষ করতে পারছি না | মানি আর নাই মানি, "দোল দোল দুলুনি" ছড়াটি কিন্তু আমার মনে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল | তা নাহলে আমার ঘরে পতিকে আহ্বান করতে দ্বিধা হয়েছিল কেন? কেন আমি ভেবেই নিয়েছিলাম যে আমাকেই যেতে হবে?

"হায় রে বাঙালি মেয়ে
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!"

•••••✹•••••

পিতা ও কন্যা

শেলী শাহাবুদ্দিন

বঙ্গবন্ধু, আমাদের কাছে কখনই নও মৃত |
রক্ত তোমার নদী হয়ে আজও সারা দেশে প্রবাহিত |

স্বপ্ন দেখানো যৌবন তুমি, মহাবিপ্লবদ্রষ্টা,
দুঃখী বাঙালীর পরম বন্ধু, বাঙালীর যুগস্রষ্টা |
হৃদয় তোমার ছিল সুবিশাল, সেই তো তোমার দোষ,
দুঃখী মানুষেরে ভালবেসে তুমি বাড়ালে ওদের রোষ |

আরো অপরাধ, বাঙ্গালীরে তুমি করেছিলে বিশ্বাস!
সেই বাঙালী, মানুষ এরা নয়, কেড়ে নিল তব শ্বাস|
ছিলে নিজগৃহে ঘুমে-জাগরণে, রাষ্ট্রভবনে নয়,
শান্তরসাস্পদ সেই গৃহে, দানবের হ'ল জয়|

হতে যদি তুমি ক্ষুদ্র হৃদয়, বিশ্বাসহীন প্রাণী,
বাঙালীরা আজও রয়ে যেত সেই পূর্ব-পাকিস্তানী|
ক্রীতদাস আর বিদূষক হয়ে ভাঁড়ামির প্রতিভায়,
দুধ-কলা যারা আশা করেছিল, তারাই কুৎসা গায়|

সেদিনের সেই মুখোশ পরানো হায়েনা-শকুন দল,
কৃমিকীট হয়ে কুরে কুরে খায় আজো সমাজের বল|
মহাদোষী তুমি, স্বপ্ন দেখেছ, কনকাম্ভোজ দেশ;
তোমার স্বপ্ন, বিদেশী শোষণে, বাধা হল শেষমেশ|

তোমার কন্যা, সিংহশাবক, তোমার রক্তধারা,
পঁচাত্তরে জীবন্ত-মৃত, দুঃখে পাগলপারা|
আজি বিস্ময়! মহাবিস্ময়ে দেখি মৃতপ্রায় সন্তান,
তোমার স্বপ্ন সার্থক করে ইতিহাসে নিল স্থান|

তলাহীন ঝুড়ি, আরো কত কুড়ি, কুৎসারে করি তুচ্ছ,
কনকাম্ভোজ রাষ্ট্র গড়িছে, তোমারি স্বপ্নগুচ্ছ|

.....✹.....

কথা প্রেম ক্লান্তি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ঠিক শব্দ না পেলে কবিতা হয় না|
একেক দিন কথা নেই বলে কবিতা নেই,
একেক দিন প্রেরণা নেই বলে,
একেক দিন, এমনিই, ক্লান্ত বলে|

আজ বহু দিন পর কবিতা লিখতে বসেছি|
জানি না, কে কোথায় আছে,
শব্দ, প্রেম, প্রেরণার মিহি বালি...
তবু ঠিক করেছি, আজ লিখবই,
যে ভাবেই হোক|

শব্দহীন হলেও লিখব
প্রেরণা না এলেও লিখব,
অবিশ্বাসের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে
সমস্ত শক্তি একত্র করে মন্ত্রের নিঃশ্বাসে,
মাটি-পৃথিবীর হাওয়ায় ফুসফুস ভরে নিয়ে –
লিখে যাব মাটিরই গান|

জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নিথর-যোনি
সেই সব মোহকল্প মায়া-রমনীর প্রেমের কামনায়
যেই নদী চলেছে মর্মর,
সেই সব আনন্দ-লহরী, ভেসে যাওয়া সময়
অনাদির অনন্ত কুহকে ভরা, চিরন্তন প্রাণের গানে
ভাঙা মন ভরে নিয়ে, লিখে যাব|

শব্দের মায়া না থাকুক,
স্বপ্নের নগ্ন হাত না ডাকুক,
ফলন্ত গাছের শরীরের মায়ায় –
নাও ডাকে যদি এই গান,
তবু জানি, তোমারই ঠিকানায় পৌঁছাবে ওরা|
যেমন পৌঁছাত,
শব্দ, প্রেম, স্বপ্নের প্রেরণা
ফিরে পাওয়ার দিনে|

.....✹.....

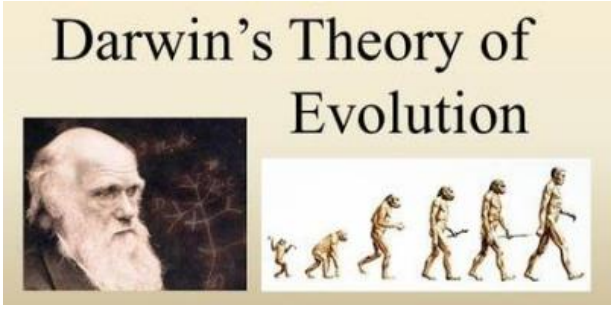

ডারউইন

অযান্ত্রিক

ডারউইন ঠিকই বলেছিলেন, বিবর্তন সহজাত, জীব সমাজে
সময়, সেও পাল্টায় টিক টিক ঘড়ির কাঁটায়।
মানুষ প্রেম আওড়ায়, অলিতে গলিতে পার্কে বাসে রাস্তায়,
প্রেমে পড়তে পড়তে ছেলেগুলো প্রেমিক হয়ে যায় অথবা কবি।
প্রেমিকের থেকে পুরুষ, পুরুষের থেকে স্বামী,
সন্ধ্যা হলে ঘামে ভেজা রুমাল বাড়ি ফেরে, চা খায়।
তারপর, ছেলেকে পড়াতে পড়াতে হিসেব করে বিমার প্রিমিয়াম।
পাটিগণিতের প্রশ্নাবলি তিনের দাগের ছয়ের অঙ্কে
চালের বর্ধিত দাম,
অথবা, মুছে নিয়ে চশমা ভাবতে থাকে পেনশন
একসময় খাবার টেবিলের সমঝোতা শেষ হলে দাঁড়ায় বারান্দায়,
বিড়ি ধরায়, আর পাল্টে যাওয়া প্রেমিক মুখ খোঁজে।

আর মেয়েগুলো, যারা একদিন এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস
কচি শিরদাঁড়ায় করে পৌঁছে দিয়ে আসত, গুমোট হৃদয়ের ঘরে।
তারা, প্রেমিকার নাম নিয়ে সেরে ফেলে
কোনো একটা অচেনা ঘরের,
সাথে একটা দীর্ঘ মেয়াদী অবস্থান চুক্তি।
যাতে বন্ধ হয়ে যায়, শখ শৌখিনতার ছোট ছোট জানলাগুলো।
বিবর্তনের স্রোতে কেউ হয় বউ, বউ থেকে মা, মা থেকে...
ডারউইন ঠিকই বলেছিলেন,
বিবর্তনে এক সময় সেদ্ধ হয়ে আসে চাল,
কিন্তু রান্নাঘরে জ্বলতে থাকে আলো।

•••••✹•••••

অকিঞ্চিৎ

অর্চিষ্মান বাগচী

জীবন,
তোমার বিপুল সৌন্দর্যের আগে
নিজেকে বড় তুচ্ছ লাগে
প্রেমের পূর্ণদীঘি আঁখির সামনে
নিজেকে বড় তুচ্ছ লাগে।

মনের মঞ্জিরায় অবিরাম
বাজে এই কথা

তোমার পর্বতস্পর্শী মেঘের সামনে
নিজের এই উচ্চতা
তোমার অনন্তনীর মমতার সামনে
নিজের কৃপণ ভালবাসা
তোমার পবিত্র শঙ্খনাদের সামনে
নিজের সব সঙ্গীত

বড় তুচ্ছ,
বড় তুচ্ছ লাগে।

•••••✹•••••

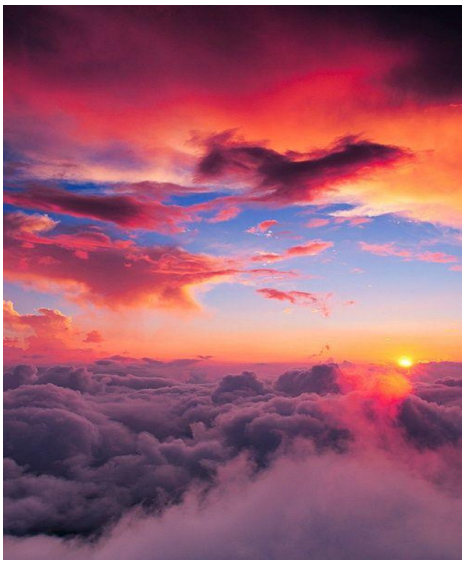

করোনামঙ্গল

সুজয় দত্ত

থালাবাটি বেজে ওঠে ঝনঝন রবে।
গলিতে গলিতে আজ উৎসব হবে।
প্রতিটা মফস্বল প্রতিটা সিটির
দুনিয়াকাঁপানো এক সেলিব্রেটির
বরণের উৎসবে যোগ দেওয়া চাই –
মিডিয়া তুলবে ছবি, দেখবে সবাই।
কে এই সেলিব্রেটি? শোনো পরিচয় –
হাঁচিতে কাশিতে তাঁর চলাফেরা হয়।
চেহারাটা গোলগাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি,
উহান শহরে নাকি ছিল আদি বাড়ী।
সার্স হল দাদা, মার্স মাসতুতো বোন,
সৎভাই flu-কে তো চেনে লোকজন।
হঠাৎ জাগল শখ পৃথিবী ঘোরার,
মানুষের ঘাড়ে চেপে মজাসে ওড়ার।
ইউরোপ আমেরিকা জাপান কোরিয়া
দিল্লী-বম্বে থেকে বেহালা-গড়িয়া
সব ভুলে কাজ ফেলে জোড়হাতে কাঁপে।
ভাবে এ মরণদশা হ'ল কোন পাপে।
প্রথমে বোঝেনি লোকে কেউকেটা বলে।
ভেবেছে "এসেছে আজ, কাল যাবে চলে"।
তারপর হাহাকার পাড়ায় পাড়ায়,
হাজারে হাজারে লোক স্বজন হারায়।
ধন্য এর সাম্যবোধ – কারো নেই ছাড়,
রাজা-মন্ত্রী সাদা-কালো করে না বিচার।
দেশনেতাদের মনে জাগালো সে ভীতি,
তারই মাঝে তলে তলে চলে রাজনীতি।
"দ্যাখো আমি কী লড়ছি সারা দেশময় –
মনে রেখো এ কথাটা ভোটের সময়"।
লকডাউন জারি হ'ল, সব হ'ল ছুটি,
কোটি কোটি গরীবের গেল রুজিরুটি।
অন্নহীন কর্মহীন আশ্রয়হারা –
পাঁচ'শ মাইল হেঁটে গ্রামে যাবে তারা?
দূর, অত ভেবো না তো! বাড়িও না বোঝা।
এক'শ তিরিশ কোটি সামলানো সোজা?
মারা গেছে আজ লোকে, মারা যাবে কালও।
"সাথিও", "মিত্রো" সব মোমবাতি জ্বালো।
মাথাটা ঠান্ডা রাখো, অত ভয় কিসে?
কে বলেছে মারা গেছ কোভিড উনিশে?
হার্টের অসুখে আর পেটের ব্যামোয়
ভুগছিলে শুনলাম মরার সময়?
সরকারী ডেথকাউন্ট যদি যায় বেড়ে,
ভেবেছ বিরোধী পার্টি দেবে সেটা ছেড়ে?
ভেন্টিলেটর আর মুখোশ না পেলে
চুপচাপ মরে যাও বিনা শোরগোলে।
ঠিক আছে, না হয় আমি নিলাম বিদায় –
তোমরাই বুঝো ঠ্যালা, আমার কী দায়?
মহামারী একদিন চলে যাবে ঠিকই।
প্রশ্ন অনেক তবু রেখে যাবে লিখি।
বেঁচে যাও কোনোভাবে এযাত্রা যদি,
ভেবে দেখো কোন খাতে বয়েছিল নদী।
কী কী ভুল করেছিলে, কিসে হত ভালো?
কিসেতে সময়-শ্রম বৃথা শুধু ঢালো?
কিসের আস্ফালন? কিসের বড়াই?
বিনা প্রতিরোধে কেন হারলে লড়াই?
শুনলাম মঙ্গলে দেবে নাকি পাড়ি?
তার আগে ঠিক করে সামলাও বাড়ী।
সাগর ফুলছে আজ, মলিন আকাশ,
ভারী হয়ে আছে বিষবাষ্পে বাতাস।
সবুজে সবুজ বন, নদী ভরা মাছে –
ধ্বংস করলে সবই লালসার নাচে।
ভেবেছ যা খুশি তাই চলে পৃথিবীতে?
দেখে নিও – প্রকৃতিও জানে শোধ নিতে।
এখনো সময় আছে - নিজেকে শুধাও –
বাঁচতে চাও, না শুধু মুনাফাই চাও?
টাকা বুঝি খাওয়া যায়? লোভে পেট ভরে?
মুনাফার ওষুধে কি মহামারী সারে?
দেখলে তো সারে কিনা, মৃত্যুমিছিলে
কাতারে কাতারে লোক – সাক্ষী তো ছিলে।

তারপরও ফিরে যাবে পুরনো পথেই?
সেই যুদ্ধের মাঠে? সেই বিভেদেই?
বিভীষিকার এই স্মৃতি ভুলে যাবে কাল?
আবার কাটবে বসে নিজে নিজ ডাল?
ধন্য তুমি কালিদাস – নমি পদতল,
শোনে কথা পুণ্যবান – করোনামঙ্গল |

.....✷.....

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

বন্ধ ঘরেই মুক্তি ওরে
তাইতো সবাই বদ্ধ,
আজকে মোরা মৃত্যু ভয়ে –
ভাবনাও নিস্তব্ধ!

অণুর সম ক্ষুদ্র যে প্রাণ,
কেড়ে লয় সে সহস্র প্রাণ,
কোন সে আশিস দেন ভগবান
বলেন হতে শুদ্ধ?

সংসারেতে দেবার সময়
ছিল যাদের শূন্য,
তারাই আজি বন্দী ঘরে
সবার সাথে পূর্ণ!

অনিশ্চয়ের দোলায় জীবন,
আর কতদিন চলবে এমন,
জানেন শুধু সেই 'মহাজন'
যিনি সবার উর্ধ্ব!

.....✷.....

ভালবাসার দিন

কমলপ্রিয়া রায়

ভালবাসা – ছোট্ট একটি কথা
আজ তোমাকে নিয়েই আমার দিন শুরু
আমার পথ চলা –
এইটুকুনি মিষ্টি কথার কী মাধুর্য
মন ভরে যায়, প্রাণ ছুঁয়ে যায়
গান গেয়ে উঠি তোমার সঙ্গলাভে!

কিন্তু কেন? পৃথিবীতে এত ঘৃণা কেন?
কেন এত ক্রোধ? কেন এত দ্বেষ?
কেন এত হিংসার ক্লেদ ছড়িয়েছে বিষ?
ঘন কালো কুয়াশা ঢেকেছে সকালের আকাশ
যেন ডাকিনীর কুটিল নিঃশ্বাসে ভরেছে দখিনা বাতাস!

তবু, আজি তো ভালবাসার দিন –
ভালবাসা, তুমি আবারও এসো
সমস্ত কালো কুয়াশার জাল ছিন্ন করে
নরম আলোতে পরম আদরে
ভরে দাও আকাশ বাতাস,
যে আলোতে আমরা সবাই হাসব, সবাই গাইব
ভালবাসার হাত বাড়াব একে অপরের দিকে,
সরিয়ে দিয়ে সমগ্র ঘৃণার রাশি –
তবেই তো বেজে উঠবে তোমার মোহন বাঁশি
সবাই মিলে গাইব আজ "ভালবাসি ভালবাসি" |

.....✷.....

মহাদৈত্য করোনা

রঙ্গনাথ

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস
দেশে-বিদেশে, গ্রামে-গঞ্জে
আনছে আতঙ্ক, তোলপাড়।
এ এক অদৃশ্য মহাদৈত্য
একে ঠেকানো অসাধ্য
এ অতি দুর্দম-দুর্নিবার!

করোনা ছুটে ছুটে বেড়ায়
অবাধে, আলোর গতিতে;
তার প্রসার দুনিয়া'ভর।
সে ছোট-বড় নির্বিশেষে
করে শ্বাসরোধ আর কশাঘাত;
সে ক্রুদ্ধ মানুষের উপর।

জনগন, নেতারা দিশাহীন!
পারে না দৈত্যকে রুখতে
ঠিক সমাধান খুঁজে পায় না –
কোথাও কোথাও কারফিউ
কোথাও স্কুল কলেজ বন্ধ
কোথাও বন্ধ অফিস কারখানা।

সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে
মানুষ রহে ছয় ফুট দূরে
কোথাও হচ্ছে না খুব ভিড়।
বাজার দোকান বন্ধ বা ফাঁকা
পথে নেই তত রিক্সা, গাড়ি
থমথম ভাব, সব ধীর, স্থির।

কোন জনসভা আর হয় না
ঘরোয়া পার্টি, অনুষ্ঠান বন্ধ;
ময়দানে নেই খেলোয়াড়, ভক্ত।
দুর্ভোগে যারা মাগে করুণা
পারে না যেতে উপাসনালয়ে
তারা ভরসা-শূন্য, মর্মাহত।

নৃশংস এ করোনার জন্যে
মরছে মানুষ হাজারে হাজার
মানুষ হয়েছে দারুণ অসহায়।
বিশ্বের প্রতি ঘরে ঘরে
গৃহবন্দী যত স্বজন-পরিজন
ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি চায়।

করোনাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত
তাকে জালে ফাঁসানো যায় না;
তাকে মারতে দরকার বজ্রবাণ।
মানুষ এ মহাদৈত্যের ধ্বংস চায় –
দৈত্য ও মানুষের এ যুদ্ধে
রক্ষা হোক মানুষের জান-মান!

•••••✹•••••

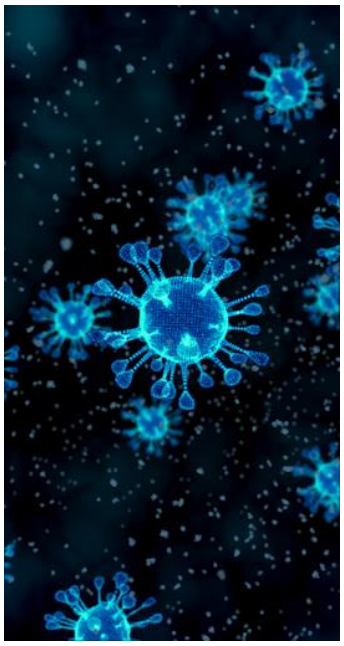

লাভ ইউ জিন্দেগী

সফিক আহমেদ

ম্যানহ্যাটেনের গগনচুম্বী ইমারতের
ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের জানলার ধারে
খোলা চুলে বসে আছ
হাডসন নদীর দিকে তাকিয়ে|
সকালের সোনালী আলো তোমার
কালো চুলে ঝিকমিক করছে|
তবে তোমার হাতে আজ
প্রিয় কবি পাবলো নেরুদার প্রেমের কবিতা নেই
তার বদলে হাতে নিয়ে বসে আছ
আলবার্ট কামুর লেখা The plague|
উদাস চোখে গুনছ মৃত্যুর সারি,
সামাজিক দূরত্ব আজ কুরে কুরে খাচ্ছে,
প্রাণবন্ত প্রিয় নিউ ইয়র্ক শহর আজ শুনশান
শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করছে রাস্তাঘাটে|
স্থানু হয়ে বসে আছ বই হাতে
ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম
তোমার দু'চোখে ঘুম আর ঘুম
তোমার চোখের পলক নড়ে না
আমার চোখের পলক পড়ে না
আশ মেটে না তোমায় দেখে দেখে
অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম
তোমার ঘুমের রাজ্যে
সেখানে দেখলাম এক অন্য তুমি
গলা ছেড়ে গাইছ
"সাবধানে আমি বাঁচতে চাই না রঞ্জনা
শুনতে চাই জীবন সুরের ব্যঞ্জনা
জীবনের ভিড়ে চলতে চাই হাতে হাত রেখে
চাই না আমি শব-বাহকের কাঁধে কাঁধ দিতে|
ভেঙে যাক আজ শ্মশানের এই স্তব্ধতা
ফিরিয়ে দাও জীবনের সেই উষ্ণতা
সাবধানে আমি বাঁচতে চাই না রঞ্জনা
চাই না আমি জীবন থেকে বঞ্চনা"|
ভেবো না শাওন
কেটে যাবে এই দুর্দিন
আবার তোমার হাতে উঠে আসবে পাবলো নেরুদা
"When I die I want your hands on my eyes:
I want the light and the whiff of your beloved hands
to pass their freshness over me one more time"
আবার আমরা চলব টাইম স্কোয়ারে হাতে হাত রেখে
মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাব
ফিরে পাব জীবনের ছন্দ
"আমরা করব জয়, আমরা করব জয়,
আমরা করব জয় নিশ্চয়" একদিন|

•••••✹•••••

আমাকে ভেঙেছ বিনষ্টিতে

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আমাকে এমন ভাঙো প্রতিটি সাক্ষাতে,
কোথাও যাই না আমি, যেতে পারি না;
নির্লিপ্ত মরুভূমি হয়ে খুঁজি অনবদ্য নীলিমা|
হাতের আঙুলে এত শব্দ মেখেছো তুমি!
ঠোঁট রাঙ্গিয়েছ গানে,
মানুষের হাহাকার মানুষ বোঝে না,
শুধুই নিজেকে বেচতে ভালবাসে|
দুঃখিত তারা, অশ্রু জমে আছে আকাশের নীলে,
এখনও বোঝনি তুমি কী রঙ্গিন সাক্ষাতে অভিলাষী আমি,
অভিলাষী ধ্রুবতারা, ধুয়ে মুছে গেছে প্রেমের বিপণী যত,
ধুয়েছে সমকাল –
আমাদের একান্ত আশ্রয় ফুডকোর্ট মালটিপ্লেক্স পপকর্ন কোক|
কোথাও যাই না আমি, ডাকুক তারারা;
তাদের সমীপে বক্তব্য কিছু নেই -
নক্ষত্রপল্লী বরাবর আমার মনোনীত,
তথাপি কেউ তো ভালবেসে ডাকবে,
আমাদের জীয়ন কাঠি কেউ তো ছোঁয়াবে,
অথচ কী উন্মাদ প্রতিযোগিতা!
হলাহল পান করি মানুষের ভিড়ে,
হিমস্পর্শ শিশিরে আমি উন্মাদ খুঁজি প্রেম,
সেও তো হারিয়েছে কোথায় ভোরের কুয়াশা নাড়িয়ে!

.....✹.....

তুমি এসো তুমি এসো

শ্রী সদ্যজাত

একটা ভীষণ অসীমতা ঘিরে আছে ওই দুটি চোখেতে,
আমি যদি সেকালের পূর্ণ কবীর পুরুষ হতাম,
তবে ওই নীলাম্বরী চোখেতে বহু শাশ্বতের এক মরমী পথ
আঁকতাম,
এই গেল দিনে তোমার রোদবৃষ্টির অপেক্ষাতে ছিলাম বহুক্ষণ,
তাকিয়ে ছিলাম অনামী দরজাটার দিকে
তুমি এলে না... পরের বার এসো কিন্তু,

কি জানি
এই বাসন্তী আকাশে ক্ষণিক শ্রাবণ যদি নামে অকাতরে,
সেই ব্যাকুলতার কালবোশেখী চরণে কত আঁচড়ের দীঘিজল
টুকরো কালো মেঘ হয়ে ঝরে পড়ে,
শতাব্দীর ক্ষয় শতাব্দী জেনেছে কখনো?
শতাব্দী আসে আরেক শতাব্দীকে রেখে-ঢেকে,

মদির অপূর্বতা ছেয়ে আছে চেয়ে আছে মিলনের দিগন্তটুকু ছুঁয়ে
আমি থাকব চির অস্ফুট তন্ময়ে তোমার আঁচল সাঁঝে ছেয়ে...
তুমি এসো তুমি এসো তুমি এসো মৃন্ময়ী রাঙা পায়ে আদুরে
অপরাজিতা হয়ে,
তুমি এসো,
তুমি এসো...
পড়ন্ত বালুচরে ভালো যদি বাসি সারাটিবেলা,
তবে প্রতিদান কেন
তবে মণিহার কেন...

.....✹.....

দাগ

নমিতা রায়চৌধুরী

তোমাকে ছাড়াই এখন
রাতের বুকে হাসুনোহানা আবেশ ছড়ায়,
পিলসুজে বাতি তার বুক জ্বালিয়ে
জাগে না নিদ্রাহীন কোনো রাত!
সময়ের অলিন্দ বেয়ে নেমে আসে
কত শত টুকরো স্মৃতির ভিড়, তবু
প্রেমের ডিঙায় লাগে না জোয়ার।

কোজাগরীর নরম আলোয় আজও
অমোঘ সুখে ডুবে থাকে শুক-সারী।
জোনাকির ঠোঁট ছুঁয়ে দেবে বলে চুপিসারে
বেতস বনে জোছনাও উঁকি দিয়ে যায়।
তুমি ছাড়া, হ্যাঁ, তুমি ছাড়াই
অতসী আজ পরিপূর্ণ,
আলোর রেখায় জীবন ছুঁয়ে যায়...

অথচ একদিন,
তুমি আসবে বলে –
নিশি জেগেছিল অন্তহীন!
প্রহর এঁকেছে নিকনো উঠোনে রঙিন আলপনা,
স্বপ্নমাখা শিশিরস্নাত শিউলি সকাল!
কেবল তোমাকে –
শুধু তোমাকে ভালবেসেই,
উদাসী হাওয়ায় বেজেছিল একটানা,
একটি সুর, বৃন্দাবনী সারং!

আজ তুমি নেই, হয়তো বা আছ,
হৃদয়হীন কেবল এক ভঙ্গুর অবয়ব!
হাওয়ার বুকে রোজ কান পেতে শুনি,
বদলে গেছে আদিম চিরচেনা সুর।
তোমার ছোঁয়ায় বসন্তের গায়ে
লাগে না এখন রঙের ফাগুন,
গান গেয়ে ওঠে না জোনাকি রাত।
উদাস দুপুর নীরবে আজও ডেকে যায়,
সন্ধ্যার বুকে নামে নির্জন নিশুতি রাত্রি।
ইচ্ছে হলেই আজও শরতের স্বচ্ছ আকাশে
মুখ ধুয়ে নেয় ক্লান্ত সবুজ বিকেল!

সবই আছে, ঠিক আগের মতই
উচ্ছ্বসিত প্রাণ –
কেবল তুমি নেই, তুমি আর নেই...
তুমি থাকো না কোথাও!
তবু, ভালবাসার পদ্ম তো রোজই ফোটে,
চাঁদ হেসে হাতও বাড়ায়,
নীলকণ্ঠ পাখি তেমনি সুর সাধে মণিকোঠায় –
শুধু পদ্মের গায়ে আজীবন লেগে থাকে
তোমার অকারণ উপহার,
এক বিন্দু নীল রঙ অবিশ্বাসের দাগ!

.....✹.....

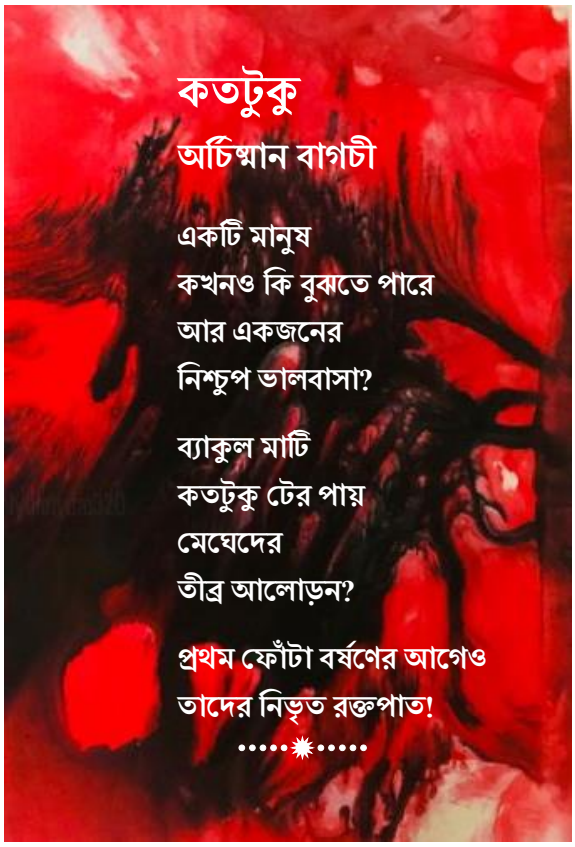

প্রবাহ জীবন

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

সমস্ত দুপুর ধরে নীল নীলিমায় তাকিয়ে দেখি
তুমি যাচ্ছ চলে,অন্তহীন সব কিনারা পার হয়ে!
যখন বিকেল হবে রোদ পড়ে যাবে
দু'একটা উদাস ভাবনা আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগন্তিকায়
এলোমেলো বাতাসে
আর বৈঠা হাতে বেয়ে চলে
স্রোতের মুখে অস্থির দোলায় মনমাঝি|
কখন যে গোধূলি মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশের কাছে
বাষ্পভেজা চোখের পাতায় দেখি – বাতাসে ছড়িয়ে পড়া
উতল হওয়ায় উড়ে চলে তোমার আঁচলখানি|
ছায়ার প্রলেপ দেখব তোমার প্রতিচ্ছায়া জুড়ে,
বিকেলে বাউলের ঘরে ফেরা উদাসী একতারায় কান্নার সুরে|
কখনো বা ঘরময়, ভাবি তোমাকে নিয়ে তোমার জন্য|
যতই গন্ডি কেটে দিয়ে যাই লক্ষ্মণ রেখায়,
দু'বাহুতে স্বপ্নগুলোকে সাথে নিয়ে বন্দী করে –
আর যতটা বসন্ত তুমি চেয়েছিলে আমার কাছে
আমি তো পৃথিবীর আদি অন্ত থেকে
এনে দিয়েছি তোমায় হাজার বসন্তকে|
আর দু'চোখভরা স্বপ্ন আশায় শৈল্পিক আকারে রামধনু রঙে
আঁকতে চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে|
আজ সময়ের পরিবর্তনের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়েও একা লাগে,
শূন্য হতে বিষাদে ভরে ওঠে মন,
আর শোক মিছিলের রাস্তা জুড়ে নেমে আসে শোক যন্ত্রণা
মনে পড়ে সেই অনাথ কিশোরীর গলায়
অগোছালোভাবে বৃষ্টি-ঝরা গান|
আর, আর্দ্র ধূসর সীমাহীন বঞ্চনার শিকারে জর্জরিত একলা
নিঃসঙ্গতা ক্রমশ গ্রাস করে|
এইভাবে ঝলসে যাওয়া মায়াবী বসন্ত হারিয়ে
পাগলিনীর কণ্ঠের গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়
একাকী নগরে – তোমার মাঝে আমার
বিরহের ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে|
আমি পারিনি পৌরুষের আস্ফালনে তোমাকে আটকাতে,
চাইতে পারিনি কোনো উত্তর,
শুধু স্বপ্নহারা রাতের শুকতারার মতো এখন
দুঃখগুলো ছুটে বেড়ায় পথে ঘাটে,
আমি এখন অন্বেষণে,
শূন্য বিষাদের অদ্ভুত মন নিয়ে
আমি ধাবিত চলমান স্রোতে!
আবহমান কাল ধরে জানতে চাই তোমার কাছে
মণিকোঠায় স্মৃতির কোণায় ভর করে –
'যার কাছে শুয়ে আছো,
তার ঠোঁটে কি মিশিয়ে দিচ্ছ আমার নিয়ত ভালবাসা?'

•••••✷•••••

প্রবাস

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যের এক পশলা বৃষ্টি,
রেল কলোনীর ভেজা হাওয়ায়, পুটুস ফুলের গন্ধ,
বুকে পাতা রেললাইন, বৈদ্যুতিক আলো,
বাতাস ছিঁড়ে এঞ্জিনের বাঁশি,
হেডলাইট থেকে ছড়িয়ে পড়া টুকরো টুকরো রেণু
সর্পিল ইস্পাতরেখা বেয়ে যায় দূর দূরান্তে

দমদম এয়ারপোর্ট,
বাক্সে গোছানো গরম জামাকাপড়,
নারকেল নাড়ুর কৌটো,
বোইং 747, ব্রিটিশ এয়ারওয়েস,
ভিসিটিং ডেক থেকে ছোট হতে থাকা হাত,
উঠতে উঠতে জানলায় শীত, বিন্দু বিন্দু জল
জল থেকে বরফ নীল,
কাঁচের ওপারে ভেসে ওঠা মায়ের বিষণ্ন মুখ

সর্ষে ফুলের ক্ষেত, বোরো ধানের সবুজ
বলদে টানা গাড়ি, চাকায় এঁটেল মাটির নালিশ
পড়ে আছে ইঁট, বালি, সিমেন্ট
মেরামত হয়নি মন্দির,
সন্ধ্যে নামতে আরতি
আলো আর ধোঁয়ার আবর্তে বিশুষ্ক পাথরের চোখ,
ফুসফুসে কমতে থাকা অক্সিজেন

কাঁচের দেওয়াল পেরিয়ে বরফগলা রোদের অপেক্ষা
জোড়া লেগে থাকা চেয়ার, সাইনবোর্ডে মুক্তির উৎসব
শীততাপে নিয়ন্ত্রিত কাগজফুল,
জানলার গায়ে বনসাই ছোট হতে হতে
খাঁচায় খাঁচায় মিলে গেল আঙুলের মহানদী রেখায়
মিলে গেল আমার রাতের পরিধি
আর মুখমন্ডলের ঘনত্ব

ডাক এল ‘ওয়েলকাম হোম’,
আমি জিভের নিচে আকাশটা ঢেকে রেখে বললাম ‘থাঙ্কস’!

•••••✹•••••

কবিতা

অমিতাভ মিত্র

অনির্দিষ্ট কিছু শপথের নামই তো কবিতা,
পাতায় পাতায় লেখা হয় রক্তক্ষয়ের ইতিহাস
মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পতপত করে ওড়ে টকে যাওয়া টকটকে
লাল নিশান।

ভুঁইফোঁড় কিছু ইচ্ছে মাঝেমধ্যে পাল্টিয়ে দেয় পর্দা,
ঝকঝকে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয় লাজবন্তী লোরি,
আতরদানি থেকে ছিটিয়ে দেয় স্বপ্নের মেহেক,
তাতে সাময়িক পাল্টে গেলেও ...
সামগ্রিক ধূসরতায় ছেয়ে থাকে আকাশ।

বৃষ্টিভেজা দুপুরে পাতা থেকে উঠে এসে অক্ষরেরা
বুলিয়ে দেয় চামর,
মনে করিয়ে দেয় অহেতুক অনাহারী সেইসব দিনলিপি,
ঘনঘোর ঘুম ভাঙ্গিয়ে অনিচ্ছুক মনকে পাঠিয়ে দেয় কৃষিকাজে,
জরাগ্রস্ত রাতের সেইসব প্রলাপগুলোই হয়তো কবিতা
যার...
প্রতিটি শব্দের কপালে জ্বলজ্বল করে বিলাপের টিকলি।

•••••✹•••••

স্বপ্ন

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ভাবনারও ওপারে সেই নদী |
নদীজল, চিকন মেঘের ছায়া-ভাসা,
ভাষাহীন ঢেউয়ের ভেঙে পড়া...
যতদূর চোখ যায় বালি আর ঘাসজমি,
মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে,
মনে মনে সেইখানে গিয়ে বসি |

দূরের সূর্য ডুবে যায় কমলা রঙের জলে –
ঢেউ ওঠে গাঢ় নীল;
ধীর পায়ে সন্ধ্যা এসে নামে |
গাছের নির্জন শরীর দুলে ওঠে হাওয়ায়;
ঘুমের স্পর্শের মতো –
ভালবাসা ছড়িয়ে যায়...
ভ্রূণ হয়ে কোমল গহনে |

ছল-ছল, নদী গায় |
চাঁদের আলোর থেকে রেণু,
মনের ভ্রমের থেকে মন,
মিশে যায় ঢেউয়ের শরীরে |
বৈরাগী ভ্রমর নেচে ওঠে আনন্দ-গানে,
ঢেউ-তানে, ভেসে ওঠে হারানো শরীর তারও,
ডুবন্ত রাত পড়ে থাকে অবশ, বিহ্বল...

পড়ে থাকি আমিও...
তারপর, শেষ-রাতে,
নতুন মেঘের ছায়ায় চাঁদ ডুবে গেলে, ফিরি;
এখানে, ক্লান্তির কোটরে |

•••••✷•••••

একুশের ডাক

রঙ্গনাথ

একুশের ডাকে জাগ্রত মাতৃভাষা, দেশপ্রেম পায় বিকাশ
একুশে পাই দেশ, ভাষা নিয়ে সগর্বে বাঁচার আশ্বাস
একুশ থাকায় বিশ্বজুড়ে সব মাতৃভাষা পায় প্রভূত সম্মান
মানুষের মাঝে সাত হাজার বিচিত্র ভাষা থাকছে অম্লান |

একুশের ডাক সদা রুখে দাড়াই যে কোন অপকর্ম হলে
হই সোচ্চার চাই না কভু দেশ-সমাজ যায় রসাতলে |
ভাষা দিবসে যাই যেন শহীদ মিনারে, করি অঙ্গীকার –
বন্ধ করি ঘুষ-চাঁদাবাজি, নানারূপ দুর্নীতি-অনাচার |
ঘৃণা করি লুটতরাজ রাহাজানি-হানাহানি গুম ও খুন
বর্জন করি কুশিক্ষা-হিংসা যা দেশে জ্বালায় আগুন!
চাই শান্তি চাই সুশিক্ষা, সম্প্রীতি, জনতার কল্যাণ
চাই সবার চিন্তা-কর্মে বৃদ্ধি পায় বাঙালির জয়গান |

একুশ চায় স্বদেশের জন্য রাখি ছোট-বড় অবদান
ধন্য হয় দেশ নিজেরা হই গর্বিত, অভিনন্দিত সন্তান |

•••••✷•••••

স্মৃতি অবিনশ্বর

শেলী শাহাবুদ্দিন

শূন্য-শূন্য, শূন্য-একের মালা বুনে,
অবিনশ্বর, প্রিয়ার স্মৃতি রাখি গুনে।

পাহাড় চূড়ায়, জলের তলায়, গভীর গুহায়,
তা না হলে রইত পড়ে অবহেলায়।
ব্যস্ত সে যে এই পৃথিবীর উপায় কী আর?
হায় রে জীবন, কেউ জানে না স্মৃতিরা কার।

সন্ধ্যা ঘনায়, জীবন ডাকে হঠাৎ করে,
স্মৃতিগুলির কী পরিণাম আমার পরে?
কেউ তো ওদের বুঝবে না হায় আমার মতো।
ভুল বুঝে হায় নিন্দে হবে কত শত!

আগলে রেখে যত্ন করে বহু বছর,
পরাজয়ের মহান স্মৃতি স্বপ্ন অমর।
বুকের ভেতর কৃতঘ্ন সব স্মৃতির পাহাড়,
প্রতি রাতে ভাঙে যেন পাঁজরের হাড়।

ভাঙে পাঁজর, স্বপ্ন ভাঙে, ভাঙে আশা,
এই জীবনের মহৎ স্মৃতি সর্বনাশা!
ভেবেছিলাম শুধুই আমার আর কারো নয়,
ভালবেসে স্মৃতিগুলি করিনি ভয়।

সময় এখন ফুরিয়ে যাবার হ'ল সময়,
ব্যস্ত তুমি, শুনি শুধু তোমারই জয়।
বেওয়ারিশ এই স্মৃতিগুলি কোথায় রবে?
তুমি ছাড়া কে আর ওদের বুঝবে কবে?

অনন্তকাল স্মৃতিগুলি শুধুই আমায়,
হাসায়-কাঁদায়; বিশ্বজগৎ কি এসে যায়?
এই জীবনে কারুর যাতে হয়নি ক্ষতি,
এই হৃদয়ে অবিনশ্বর সে সব স্মৃতি।

পাঁজর-ভাঙা স্মৃতিগুলি অবহেলায়
ফেলে দেব গভীর গুহায়, পথের ধুলায়?
তার চেয়ে থাক অবিনশ্বর, মহাশূন্যে,
শূন্য-এক, এক-শূন্য, অযুত শূন্যে।

হয়তো তোমার কৃষ্ণকণা মিশবে এসে,
জড়িয়ে বুকে সংখ্যাগুলি গলবে শেষে,
যে অনাদি সৃষ্টি সাজায় বিপুল সাজে,
সবই যেদিন বিলীন হবে তারই মাঝে।

·····✸·····

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

ওরে, প্রভু তোদের সকল সময়
করতে চাহেন সুখী,
বুঝে না পাস কেমন করে –
তাই, সদাই থাকিস দুখী!

যা পেয়েছিস আশিস মেনে
রাখিস আপন করে,
পেলি না যা ক্ষোভ যেন তার
না রয় মনের ঘরে।
বিষাদ জ্বালা মনের মাঝে
না দেয় যেন উঁকি।
বুঝে না পাস কেমন করে –
তাই, সদাই থাকিস দুখী।

যিনি সকল কিছুর দাতা,
অনন্ত যাঁর দান,
চাইলে যাবে কম পড়ে হায়
ক্ষুদ্র হবে প্রাণ –

তাঁরই সকল দান ভেবে আয়
সহি দহন জ্বালা,
তাঁর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে
সুখের প্রদীপ, মালা।
তাঁর আশিসে হই সকলে
তাঁরই শরণমুখী।
বুঝে না পাস কেমন করে –
তাই, সদাই থাকিস দুখী।

·····✸·····

ফিরে দেখা

সফিক আহমেদ

আমি আজকাল আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত
দৈনন্দিন জীবনে যাই ঘটছে,
মনে হয় আগে কখনো ঘটেছে।
বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, দৃশ্য
সব কিছুতেই মিল পাচ্ছি
ঘটে যাওয়া জীবন স্মৃতির,
আমি আজকাল কিছুই ভুলছি না।

হিউস্টনের বাড়িতে বসে
যখন ট্রেনের ঘন্টার আওয়াজ পাই
মনে হয় কলকাতার ট্রামটাই চলছে
ঠনঠন করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে।

মেমোরিয়াল পার্কে শীত শীত সকালে
হালকা কুয়াশা ভেদ করে আসা সূর্যের
ওম নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে মনে হয়
ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে ভোর ভোর বেরিয়ে
ময়দানে হাঁটার কথা।

অফিস ফেরৎ রুফটপ পাব-এ বসে মনে হয়
AAEI-তে বসে আছি বাল্য-বন্ধুদের সঙ্গে।

ভূমধ্য সাগরে বিলাস বহুল প্রমোদ তরী
দিচ্ছিল নীল সাগর পাড়ি
সূর্যাস্তের আলোর খেলায়
হারিয়ে গেলাম স্মৃতিমেদুর ছেলেবেলায়।
উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে
যেন জেলে ডিঙি ভাসছে
ভরা কোটালের ইচ্ছামতীর বুকে।

লাস ভেগাসে চোখ ধাঁধানো
Cirque du Soleil-এর মধ্যেই
ফিরে গেলাম পার্কসার্কাস ময়দানের
অলিম্পিক সার্কাসের তাঁবুতে।

Feria De Sevilla, স্পেনে
যখন মধ্য রাত্রে জ্বলে ওঠে
মেলার প্রধান ফটকের আলোর মালা
তুমুল হর্ষোল্লাস আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোকসজ্জাতে।

Pittsburg Point State Park
Allegheny, Monongahela, Ohio নদীর
ত্রিধারা সঙ্গম আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়
যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে।

Rotorua (Māori) আদিবাসীদের নৃত্য
আর বাদ্যযন্ত্রে দ্রিমি দ্রিমি শব্দ
আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়
আগুনজ্বলা পলাশ ফুলে
ধামসা মাদল তালে তালে
সাঁওতাল আদিবাসী মহুয়া
মাতাল নৃত্যের দৃশ্যপটে।

আমি স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে
পেন্ডুলামের মতো দুলে চলেছি
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের মধ্যে।

তাই আমি আমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত।

দ্বিমন

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

তেত্রিশ বসন্ত আগে,
যে সম্পর্কের বীজ বুনেছিল মন,
ঠিক পঁচিশ বসন্ত আগে, তা
মানব জীবনের গভীরতম সম্পর্কে পড়ল বাঁধা।

'যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব' –
পুণ্য মন্ত্রোচ্চারণে, অগ্নি সাক্ষী রেখে,
প্রেমাচ্ছন্ন দুটি মন দীক্ষা নিয়েছিল সংসার মন্ত্রে।

তারপর একে একে অনেক বাধার পর্বত,
দুশ্চিন্তার বহু বিনিদ্র রজনী পার হয়ে,
এখনও পবিত্র প্রেমের
পুণ্যাশীর্বাদপ্রার্থী সেই দুটি মন!

স্মৃতির সরণি বেয়ে পৌঁছে গেছি
এক সন্ধ্যার নির্জন সৈকতে সেদিন।
পাশাপাশি বসে যেদিন বাক্যহীন
কেটেছিল বেশ কয়েকটা মুহূর্ত!
ভাষাতীত দুটি মনের বাক্যালাপের
মাধ্যম ছিল নির্বাক।

এই জীবনের সেই প্রেম পর্যায়ে
অস্বীকার করা যায় কলকাতার অবদান?
কলকাতার ট্রাম, কলকাতার ফুটপাত, জোড়াসাঁকো, ময়দান,
রূপবাণী, রঙমহল, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনের কালীবাড়ি, কালীঘাট,
বেলুড় মঠ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, গঙ্গার স্টীমার,
সবই তো এক এক মহাসাক্ষী!

যেদিন প্রথম ঝগড়া হ'ল –
প্রেমের আবেগ থেকে বেরিয়ে সংসারের
কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া দুই মনের?
সেই প্রথম বাক-বিতর্ক ও বিবাদ!
কেমন যেন আশাহত হবার যন্ত্রণা
হয়েছিল মনে পড়ে, অজান্তে
হয়তো অশ্রু ভরেছিল দুই চোখে!

তারপর কতবার ফিরে ফিরে এসেছে
সেই সব অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত!
অনেক ভেবে এটাই মনে হয়েছে –
বিবাদ না হলে সঠিক চেনাজানা হয় দুটি মনের?
কেউ তো ঈশ্বর নই আমরা!

এক মনের "অমুক বন্ধু কেন" বলে
যেমন আপত্তি ও অন্য মনের মনখারাপ,
আর অন্য মনের "অমুক বান্ধবী কেন" বলে
আরেক মনের প্রবল অভিমান!
তারপর মাঝামাঝি গিয়ে যা দাঁড়াল –
"বন্ধুদের অনুমতি মিললেও"
বান্ধবীদের প্রবেশ হ'ল একেবারেই নিষিদ্ধ!

এখন আর ঝগড়া হলে এই নিয়ে,
দাগ কাটে না কোনও মনে!
বোঝাপড়াটা এমনই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন!
"যুদ্ধং দেহি" বলে বিবাদের পরেও,
প্রেমের সেই পবিত্র আসনটি অনড়, অটুট দেখেছি।
সেই জন্যই তো তারা "ন হন্যতে"!

বিগত পঁচিশ বসন্তে – সেই দুই মনের
মাঝে আলো ভরে এসেছে আরও দুই মন,
তাদের সান্নিধ্যেও প্রেম-বিবাদ পর্বের নেই বিরাম!
ঠিক যেন সুস্বাদু খাবার তৈরির রেসিপি –
সঠিক স্বাদের জন্য মাপমতো
লবণও লাগে, লাগে মাপমতো চিনিও!

আর কতটা ভালবাসি তার হিসেব
করতে বসে জেনেছি, নিজের ঘাটতি কতটা!
প্রার্থনা তাই সব সময় –
"ভালবাসতেও যেন পারি তার মতো"!

আর কত বসন্ত অতিক্রান্ত হবে সেই দুই মনের?
প্রেম দেবতাই জানেন তা!
একান্ত প্রার্থনা তাই তাঁর কাছে –
"সর্বসুখী যেন দেখে যেতে পারি তাকে"!
আর – প্রেমে পূর্ণ পৃথ্বী!

·····✹·····

সরল অতীত

রঙ্গনাথ

জীবন মোর কেমন ছিল আগে?
এ অতীতকে ভাবতে ভাল লাগে –
সে তো ছিল হাসি-খুশির দিনগুলো!
সদা মন ছিল তরতাজা, প্রফুল্ল;
কী ছিল দারুণ আনন্দময় দিন!
সবই ছিল মনোরম, রঙ্গে রঙ্গিন।

কেমন মোর চিন্তা ছিল আগে?
তা স্মরণ করতে ভাল লাগে –
মোর ভাবনা ছিল সহজ-সরল
উদ্যম,ব্যস্ততা ছিল ভীষণ প্রবল;
মোর সততা ছিল নিত্য সাথী;
চেয়েছিনু মাথা উঁচু করে হাঁটি।

চাওয়া-পাওয়া কেমন ছিল আগে?
সেসব কথা বলতে ভাল লাগে –
যখন চাওয়ামাত্র সবকিছু পাই
পাওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা নাই!
কত আনন্দে দিনটি যেত কেটে
নির্ভাবনায় নিদ্রা যেতাম রাতে।

সময় মোর কেমন ছিল আগে?
তা আঁকা আছে শত স্মৃতির দাগে –
খেলার সময়টা যেত তাড়াতাড়ি
চাইনি মাঠ থেকে যাই বাড়ি;
স্কুলে যখন করতাম লেখাপড়া
বুঝতাম, সব ঘোরপ্যাঁচেতে ভরা।

মোর ছোটবেলায় কদর ছিল কত?
যতবার ভাবি, মনে পড়ে তত –
ছোট-বড়রা চাইত মোর ভালো
ছিনু যেন সবার চোখের আলো।
আদর-যত্নে যখন হয়েছি ডুবুডুবু
চাইতাম না আমি হব 'বড়' কভু।

.....✸.....

ভালবাসা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

ভালবাসা মুগ্ধ করে আজও।
আকণ্ঠ নিবিড়ে ডুবে যায় ভগ্ন হৃদয়
স্পর্শ পেলে ভালবাসার।

ভালবাসা নিঃস্ব করে চলে যায় আজও।
দেবার ফিকিরে, ফুরোবার নেশায়, ফতুর হয়েও
ভ্যাগাবন্ড হৃদয়, হেসে ওঠে
আকুল সোপানে, সময়ের।
কান্না তাকে শেখায়নি এত বলিদান
শিখিয়েছে ভালবাসা যেমন।

মরমী করুণা এসে ভিজিয়ে দেয়
ক্রুদ্ধ মনের শুকনো মাটি,
ক্ষোভহীন, গ্লানিহীন, ভরে-যাওয়া মন তখন
যে কোন হৃদয়কে পারে ভালবাসতে।
ভালবাসাই ফোটায় ভালবাসার ফুল
নিঃস্বতার গোপন বাগানে।

ভালবাসা আলো দেয় তাই,
ক্লিন্ন গলি, রাজপথ, কিম্বা বিষণ্ন চর, চোরানদী...
ভালবাসা স্পর্শ করে যদি –

ফুল ফোটে অজান্তে দীনতার,
ফুল ফোটে অনন্ত শূন্যতায়...

.....✸.....

গেদু মিঞার বউ

শেলী শাহাবুদ্দিন

গেদু মিঞার নাকের ডাকে বৌ পালায়,
ত্যক্ত হয়ে মিঞা বলে, "দূর হালায়!"
ঘুমায় যখন গেদু মিঞা ভীষণ নাদে,
পেত্নীরা সব ছাদের ওপর নৃত্য ফাঁদে।
নাকের বাদ্য বাজে যখন ঘরর-ঘর (ghoror-ghor),
পেত্নী-নাচে ছাদ কাঁপে থর, থরর-থর (thor, thoror-thor)।
বাদ্য নাকের বাজে যদি দ্রুত অতি,
সমান তালে পেত্নী-নাচের বাড়ে গতি।
পেত্নীরা কয়, নাক ডাকাটা পুণ্য বটে,
নাক ডাকে যার, অচিরে তার সুনাম রটে।
ভূত মহলে নাক ডাকারা প্রেমিক সেরা,
পেত্নীরা সব তারেই বলে, "পেঁয়াঁর মেরা"।
গেদু মিঞার সুনাম বাড়ে ভূত মহলে,
দেশ-বিদেশের পেত্নীরা তাই দলে দলে
আসছে ধেয়ে পেত্নী-নাচের সম্মেলনে;
'ভূতের বছর'কুড়ি হাজার কুড়ি সনে।

ভূতের ওঝা নয়কো সোজা, মস্ত দাড়ি,
পেত্নী কুলের গন্ধ পেয়ে এল বাড়ি।
'হালুম-হুলুম' ভয় ধরানো মন্ত্র শুনে,
গেদু মিঞা মনে মনে প্রমাদ গোনে।
ছাদের পেত্নী ছাদেই থাকে, নাচের লয়ে;
ওঝার মন্ত্রে নামে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে?
ভীষণ ভয়ে স্বপ্ন দেখে গেদু মিঞা,
পেত্নীরা সব আসছে তেড়ে 'ইয়া ইয়া'!
নাক ডাকা তার যতই বাড়ে ভয়ের চোটে,
ছাদের ওপর ততই নাচের ফুর্তি ছোটে।

রাতের শেষে পেত্নীরা যেই নামছে নিচে,
হুড়মুড়িয়ে পেত্নীরানীর পিছে পিছে,
ভূতের ওঝা হাওয়া বুঝে আগেই হাওয়া;
গেদু মিঞা ভিরমি খেয়ে খাটেই শোয়া।
শুরু হ'ল দলাই-মলাই পেত্নী-মালিশ,
গেদু মিঞা জেগেই বলে, "আছে নালিশ"।

"কীসের নালিশ? কীসের নালিশ?" পেত্নী হাঁকে,
"বউরা আমার পালায় কেন নাকের ডাকে?"
খবর শুনে মুচকি হাসে পেত্নী দলে;
ঠাট্টা করে গেদু মিঞার দু-কান মলে।
নাচের সেরা, সবার সেরা পেত্নী বলে,
"গেঁদু মিঁয়াঁ তুঁমি আঁমাঁর আঁপন হোঁলে"।

সেদিন থেকে গেদু মিঞা শুধুই হাসে,
পেত্নী বউয়ের আদর-সোহাগ ভালই বাসে।

•••••✷•••••

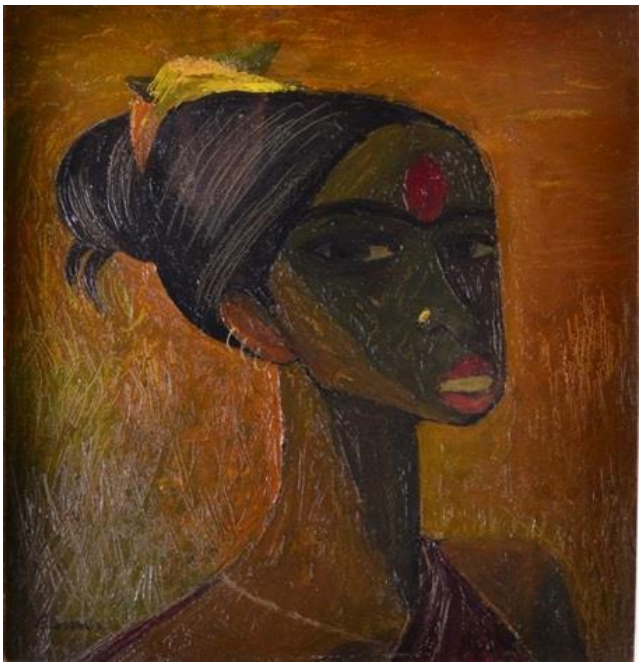

অদৃশ্য

জয়া চৌধুরী

রিনি অভিকে ভালবাসত। রিনি মানে, সেই মেয়েটা যাকে পাড়ার কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করে না। দেখতে সাধারণ, খুব সাধারণ পোশাক-আশাক, কথা কম, কিন্তু বড্ড মিষ্টি লাগে দেখতে যখন হাসে। একটা সাধারণ চাকরি করে, বাড়িতে মা ছাড়া আর কেউ নেই। রিনিকে দেখলে, আশপাশের সবাই একটু ঠোঁট চিপে হাসত, কেন জানেন? সবাই জানত, রিনি কিপটে।

রিনি অফিস যায়, বাড়ির জন্য যা প্রয়োজন সব সামলায়, আর অভিকে ভালবাসে। অভির কখন কোনটা প্রয়োজন, শরীর ঠিক আছে কিনা, খাওয়া দাওয়া করছে কিনা – সবই রিনি সামলে রাখে। রিনির নিজের কোন জীবন নেই, নিজের জন্য আনন্দ নেই, এমনকি কোন বন্ধুও নেই। রিনি এমনই! অভি একটু নেশাটেশাও করে। তাতে রিনির আপত্তি; ঘ্যান ঘ্যান করে রিনি। অভির কি সেসব শোনবার সময় আছে! অভির অনেক বন্ধু, অনেক কাজ, অনেক মেয়ে বন্ধুও! মাঝে মাঝে খারাপ লাগে রিনির। আবার মেনেও নেয়। কবি মানুষ সে। কিছু মেয়ে ফ্যান ফলোয়ার তো থাকবেই! আজকাল অভি, রিনিকে বড্ড এড়িয়ে চলে। রিনির সব কিছুতে বিরক্ত। রিনি বুঝতে পারে, কিন্তু দূরে যেতে পারে না। রিনির জীবনে যে আর কিছু নেই! নিজের সবটা বুঝে নেবার কথাও তার মাথায় আসে না, এমন মেয়েও আছে জগতে! তবে কি রিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল?

একদিন অভি রিনিকে চীৎকার করে বলেই দিল, 'আমায় বাঁচতে দাও। প্লিজ, আমায় একা ছেড়ে দাও। আমি নিজের মতো বাঁচতে চাই। আমার দমবন্ধ হয়ে আসে তোমায় দেখলে। আর কোনরকম যোগাযোগ রেখো না।'

রিনি চুপ। নীরবে বেরিয়ে আসে।

অভিকে ভালবাসা বন্ধ করে দেয়। রিনি মাথা নীচু করে অফিস যায়, নিয়ম করে মায়ের ওষুধ কেনে, বাজার করে, কাজের লোকের বেতন দেয়।

একদিন খুব ভোরে পাড়ার গলির মুখে খুব হৈচৈ। রিনি রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকে চাপা পড়েছে। ঘন কুয়াশায় রাস্তা পার হচ্ছিল রিনি। কিন্তু কেউ কেউ বলছে, ইচ্ছে করেই এ কাজ করেছে রিনি। রিনির রক্তাক্ত শরীরের পাশে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকগুলো ৫০, ৫০০, ১০০০ টাকার নোট। রক্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সেই নোটগুলো। কোন অমানুষেরও সাহস হচ্ছে না সেই নোটগুলো তুলে নেয়।

টাকাগুলো একটু একটু করে জমিয়েছিল রিনি। কেন জানেন? অভির একটা কবিতার বই প্রকাশ করার খুব ইচ্ছে। সেই ইচ্ছে পূরণের জন্য সোয়েটার বুনছিল রিনি। তাই মরার সময়েও, সেই টাকা কারো হাতে দিয়ে যেতে পারেনি। বুকে করে নিয়ে গিয়েছিল সে। হয়তো ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রাকের সামনে, কিংবা ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া রিনির চলে যাওয়ার সময় হয়েছিল, তাই চলে গেল।

কিন্তু রিনি জেনে গেল না, অভির কবিতার বই-এর কাজ প্রায় শেষ। আগামী মাসের ১২ তারিখ পাঁচতারা হোটেলে অনেক নামী দামী মানুষের হাত থেকে প্রকাশিত হবে সেই বই।

রিনিরা বড্ড বোকা। নিজে যতটা দেখে, ততটাই পুরো বিশ্ব বলে মনে করে। হয়তো এসব বোকা রিনিদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এরা চলে গেলে হয়তো একজন মানুষ কমে পৃথিবী থেকে। কারো কোন ক্ষতি হয় না!

করোনার কড়চা

সুজয় দত্ত

ছেলেবেলায় একবার ভাইয়ের হাত ধরে রাসমেলায় গিয়েছিলাম | রাসমণি বাজারের লাগোয়া মাঠটায় জমিয়ে রাসমেলা বসত তখন | টাটকা ঝালমুড়ি, গরমাগরম জিলিপি, ফুলুরি, আলুর চপ, টমটম গাড়ী, কথাবলা পুতুল, নাগরদোলা – আরো কত কী | বেশী না, বড়জোর দুটো বাস স্টপের দূরত্ব আমার মামাবাড়ী থেকে | কিন্তু তখন প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ি, পাড়ার মাঠটুকু ছাড়া একা একা কোথাও যাওয়া বারণ | তাই ব্যস্ত বাসরাস্তা পেরিয়ে পুঁচকে ভাইকে নিয়ে সকলের অগোচরে অতদূর হেঁটে হেঁটে যাওয়ার মতো বৈপ্লবিক অপরাধের শাস্তি হয়েছিল পুরো একদিন একটা ঘরে বন্ধ থাকা | দুজনেই | তারপর আজ চার দশক পেরিয়ে গেছে | সেই ভাইও নেই, সেই রাসমেলাও নেই | কিন্তু ভাইরাস আছে! আর তার ঠ্যালায় ঘরে বন্দী থাকার শাস্তিও | বিনা অপরাধে |

অবশ্য অপরাধ বোধটা যার যার নিজস্ব | বন্যায় বাড়ীতে কোমরজল ঢুকলে যেমন লোকের মনে পড়ে ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে পিঁপড়ের গর্তে জল ঢেলে তাদের ডুবিয়ে মারার স্মৃতি, বা পথ দুর্ঘটনায় পড়লে বহুদিন আগে কোনো কাঠবেড়ালিকে স্কুটার চাপা দেওয়ার স্মৃতি, তেমনি এখন ভাইরাসের প্যাঁচে পড়ে মানুষের সারা জীবনের অনুশোচনা যেন একসঙ্গে উথলে উঠছে | "ইশশ, খাঁচায় পাখী আর জন্তুজানোয়ারদের আটকে রেখে আমরা তাদের কত কষ্টই না দিই!" "উচিত শাস্তি হয়েছে মানুষের, প্রকৃতির বারোটা বাজাচ্ছিল, এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ", "চিরটা কাল উঁচুজাত – নীচুজাত বড়লোক-ভিখিরি হিন্দু-মুসলমান এসব করিস, নে এবার বোঝ ঠ্যালা – যমের দুয়ারে সবাই সমান" ইত্যাদি বাণীতে চারিদিক মুখরিত | আর তার ওপর এখন তো আবার সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ – নিজের অপরাধ বোধ বা ক্ষোভ-দুঃখ-ভয় নিজের মনে রেখে দেওয়ার সওয়াল হি নেহি উঠতা | সকালে ঘুম থেকে উঠে চিরকালের অভ্যেসমতো হাতে সিগারেট আর বাজারের থলি নিয়ে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানটায় অমুকবাবু তমুকবাবুর সঙ্গে প্রাত্যহিক গুলতানির ইচ্ছে জাগতেই বাড়ীর কত্তার ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল আরেঃ, এখন তো লকডাউন! রাস্তায় অকারণে বেরোলেই পুলিশের ধমকানি বা ঠ্যাঙানি | ব্যাজার মুখে জানলা দিয়ে বাড়ীর সামনে তাকাতেই যেই দেখলেন মুখোশবিহীন একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাথে মিষ্টির দোকানটার দিকে এগোচ্ছে, ব্যস, অমনি ফটাস করে মোবাইলে ছবি তুলে সোজা ফেসবুকে বা হোয়াটস্অ্যাপ-এ | সঙ্গে ক্যাপশন "বাঙালির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা – আমরা আর কবে শিখব নিয়ম মানতে?" যেন সাক্ষাৎ বিবেকানন্দ বা নীরদ সি চৌধুরী – ওই এক ছবিতেই চেতনার চাবুক মেরে পুরো বাঙালি জাতির চরিত্র পাল্টে দেবেন | আসলে ভেতরে ভেতরে হিংসের আগুন – ও ব্যাটা ড্যাং ড্যাং করে মিষ্টির দোকানে যাচ্ছে আর আমার বাজার ফেরত প্রতিদিনকার বরাদ্দ খাস্তা কচুরি-হালুয়ার ঠোঙাটা অবধি আনতে বেরোবার উপায় নেই? মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এটা তো আর দেখেননি যে লোকটা মিষ্টির দোকানে নয়, যাচ্ছিল তার পাশের একচিলতে ওষুধের দোকানটায় | যাইহোক, ইতিমধ্যেই মোবাইল টিং টিং শব্দে অস্থির | ফেসবুকে, হোয়াটস্অ্যাপ-এ সাড়া পড়ে গেছে সেই ছবিতে | ভাইরাসের দৌলতে কর্মহীন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর এখন এমনিতেই করার কিছু নেই, তার ওপর এমন যন্তর হাতের কাছে থাকলে লোভ সামলানো যায়? নিজের প্রগতিশীলতা জাহির করা, অন্যকে জ্ঞান দেওয়া, নিয়মনিষ্ঠতার ভান করা, রাজনৈতিক নেতাদের মুণ্ডচর্বণ আর সারা পৃথিবীর খবর পোস্ট করে করে তারিফ কুড়নো – এক্কেবারে ফাইভ ইন ওয়ান | অতএব "যা বলেছ ভায়া", "হক কথা – বাঙালির আর কিস্যু হবে না", "নাঃ, এখানেও নর্থ কোরিয়ার মতো মিলিটারি শাসন চাই – বেরোলেই গুলি", "ইতালিও তো এই করেই ডুবেছে", "লোকটাকে ধরে গণধোলাই দিতে হয়", "কী করবেন বলুন, সকলের তো আর আপনার-আমার মতো কান্ডজ্ঞান নেই" ইত্যাদি মন্তব্যে আর একগোছা "লাইক"-এ বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন কত্তা | সারা দেশের সব নিয়মভঙ্গকারীদের কথা ভেবে মনে মনে একবার আউড়ে নেন বঙ্কিম চাটুজ্জের সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" তারপর পরম তৃপ্তিতে সকালের চা-টা শেষ করে এগোন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে | তাঁকে তো আর মনে করিয়ে দেবার কেউ নেই যে এটা উত্তম-অধম বিচারের সময় নয়, এই মুহূর্তে আমরা সবাই ভীষণভাবে মধ্যম | সেই যে বলে না, "তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে"? তা এখন তো পৃথিবীজুড়ে সবাই সবার থেকে তফাতে তফাতে | সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং-এর জামানা |

কত্তা যতক্ষণ বাথরুমে কম্মো সারছেন, ততক্ষণ তাঁর মোবাইল কিন্তু ঘুমিয়ে নেই | সন্ধ্যেবেলার জোনাকির মতো বারেবারেই জ্বলে উঠছে তার স্ক্রীন | কারণ এবার অন্য এক খেলা শুরু হয়েছে | স্কোর রাখার | খেলা নয়, রীতিমতো প্রতিযোগিতা | "কলকাতা ৯৫/৫", "না না, ৯৮/৬, এইমাত্র গেল আরেকটা", "আরে, চেন্নাই ওর চেয়ে অনেক এগিয়ে, ২০০/৯", "তোরা এসব নিয়ে পড়ে আছিস, ওদিকে যে ৯০০০ আর ৩০০-র ডবল কমপ্লিট করে ফেলল" – এসব মেসেজ যদি সেভ করে বা ছাপিয়ে কয়েক বছর পর আবার ফিরে দেখা হয়, মনে হতে বাধ্য কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস-এর কোনো আই পি এল ক্রিকেট ম্যাচের দর্শক-প্রতিক্রিয়া এগুলো | আর শেষেরটা হয়তো টেস্টম্যাচে কোনো নামকরা অলরাউন্ডারের ব্যাটিং-বোলিং রেকর্ড | কিন্তু এই মুহূর্তে সবাই জানে এসব কিসের খতিয়ান | করোনা সংক্রমণ আর মৃত্যুর | যমরাজকে খুশি করার জন্য তাঁর সেক্রেটারী চিত্রগুপ্তের হিসেবপত্রের কাজ হালকা করে দিতে মানুষের এই সোৎসাহ প্রচেষ্টা, না বাতিল হয়ে যাওয়া ক্রিকেট মরশুমের অনাস্বাদিত উত্তেজনার আঁচটাকে ধরে রাখতে – সেটা বলা মুশকিল | এর সঙ্গে আছে আরেকটা বিচিত্র অভ্যাস – রেডিও-টিভি-ইন্টারনেট থেকে পাওয়া 'ব্রেকিং নিউজের' পুনঃপ্রচার | কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তি, মুখ্যমন্ত্রীর একটা ঘোষণাকে বারবার হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক বা এস এম এস-এ পাঠিয়ে কি এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা যে প্রেরকের সামাজিক দায়িত্ববোধ কত প্রখর, নাকি এতে আছে "হাঃ হাঃ, তোর আগেই আমি জেনে ফেলেছি!" গোছের একটা প্রচ্ছন্ন ছেলেমানুষি আস্ফালন? হয়তো দুটোই | মনে আছে ছোটবেলায় খবরের কাগজের হকার সাইকেল থেকে কাগজটা পাটিসাপ্টা পাকিয়ে বারান্দায় ছুঁড়ে দিতেই আমি আর আমার ভাই প্রাণপণে স্প্রিন্ট লাগাতাম – কে আগে ওটা এনে বাবার হাতে দিতে পারে | সেরকমই বোধহয় |

এ তো গেল খবরের প্রতিযোগিতা | অন্য যে জিনিসটায় সবার মোবাইল দিনরাত সরগরম সেটা আরও মারাত্মক | করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর 'ভাইরাস' ওটা – মস্তিষ্কের ভাইরাস | আর বহু বছর ধরেই মানুষ তাতে আক্রান্ত | কিন্তু করোনার এই সর্বগ্রাসী ভয় আর দমবন্ধ উত্তেজনার বাজারে তা যেন সুযোগ সন্ধানী 'সেকেন্ডারী ইনফেকশনের' মতো আরও জাঁকিয়ে বসেছে | মুশকিলটা আরো বেশী এইজন্য যে অনেকেই এই 'ভাইরাস' ছড়ানোটা দারুণ উপভোগ করে (করোনা ছড়িয়ে আনন্দ পেয়েছে এরকম কারো কথা এখনো অবধি জানা নেই)| ভুয়ো খবরের কথা বলছি | করোনার যেমন একাধিক ডাকনাম – সার্সকোভ-২, কোভিড-১৯ - এরও তাই | মিথ্যে রটনা, গুজব, আষাঢ়ে গল্প | একটা মিথ্যেকে একশ'বার বললে সেটা যে সত্যির মতো শোনায় – এ তো সবাই জানে | জেনেও তাহলে বারবার এর ফাঁদে পড়ে কেন? ওমা, সক্রেটিসের সেই গল্পটা শোনা নেই বুঝি? একবার সক্রেটিস একটা লাল টুকটুকে আপেল হাতে করে এলেন তাঁর শিষ্যদের সামনে আর আপেলটা তাদের প্রত্যেকের নাকের কাছে কয়েকবার ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তারা পাকা ফলের গন্ধ পেল কিনা | অনেকেই উত্তর দিতে দ্বিধান্বিত, কিন্তু কয়েকজন খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল "হ্যাঁ"| মুচকি হেসে তিনি আপেলটা আরও একবার সকলের নাকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে একই প্রশ্ন করলেন, "এখন গন্ধ পেলে?" এবার "হ্যাঁ"-এর সংখ্যা আগের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাও অল্প কয়েকজন মাথা নেড়ে বলল তারা কিছু পায়নি | যখন গম্ভীর মুখে শেষবার আপেলটা সকলকে কাছ থেকে শুঁকিয়ে গুরু সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, দেখা গেল সবাই একবাক্যে "হ্যাঁ"-এর দলে ভিড়ে গেছে | তখন সকলের সামনে আপেলটা আছড়ে ভেঙে তিনি দেখালেন ওটা ছিল মাটির তৈরী | অতএব বোঝাই যাচ্ছে ঐরকম একটা আজগুবি 'আপেল' বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কেউ একজন ছাড়ার পর আপনার চেনা-পরিচিতদের বেশীরভাগই যদি তাতে "গন্ধ পাচ্ছি" বলে (অর্থাৎ তার যাথার্থ বা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে সেটাকে 'খবর' হিসেবে ছড়াতে থাকে)| আপনি নিজে চূড়ান্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত না হলে একসময় না একসময় প্রভাবিত হবেনই | আবার জীবনে সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হওয়ারও সমস্যা আছে | যেমন, কেউ যদি বলে জিনিসটা দাঁতে না কামড়ে সেটাকে সে আপেল বলে স্বীকৃতি দেবে না, তাহলে কিন্তু লংকা বা উচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে তাকে ঝাল আর তেতো সহ্য করতে হবে |

যাইহোক, এদিকে কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে দুপুরের খাওয়ার সময় চলে এল | খেতে বসে কত্তা দেখেন রোজকার ভাত-ডাল-ভাজার সঙ্গে আজ বেগুন-পোস্ত আর মুখিকচুর ডালনা! কই, সপ্তাহের গোড়ার দিকে যখন বাজারে গেছিলেন তখন এসব তো আনেননি! লকডাউনের বাজারে বেলা সাড়ে বারোটায় গিয়ে দেখেন বাজার মোটেই সরকারী নির্দেশ মেনে বারোটায় খোলেনি, সকাল সকালই খুলেছে, আর তাঁর যাওয়ার আগেই অর্ধেক জিনিস উধাও | চেনা তরকারিওয়ালার কাছে "এটা নেই

কেন? সেটা নেই কেন?" কৈফিয়ত চাইতে সে আবার মুখের ওপর বলল, "আপনারা শহুরে বাবুরা এবার চাষবাসটা শিখি নিলিই সব ল্যাঠা চুইক্যে যায়"| তাহলে কচু আর বেগুন এল কোথা থেকে? বারান্দার টবের গাছে তো কয়েকটা কাঁচালঙ্কা ছাড়া আর কিছু নেই | জিজ্ঞেস করতে হেঁশেলের 'চীফ অপারেটিং অফিসারের কাছ থেকে জবাব এল, "কোন যুগে পড়ে আছ? জাস্টশপ টোয়েন্টিফোর থেকে আনিয়ে নিলাম | বিগবাস্কেট অনেক দেরী করে করে ডেলিভারি দিচ্ছে এখন, আর গ্রোফার তো বন্ধই করে দিল| তাই ওদের থেকেই..."

- "সেসব আবার কী? জীবনে নাম শুনিনি তো! খাবার হোম ডেলিভারি দেয় বুঝি? বাঃ, বেড়ে রান্না করে তো।"

- "ধ্যাত্তেরি! চিরটা কাল আমার রান্না খেয়ে এখন এটাকে বাইরের রান্না মনে হচ্ছে? ওগুলো বাজারের হোম ডেলিভারি | অনলাইন অর্ডার দিতে হয়।"

- "আশ্চর্য! তুমি এসব শিখলে কোত্থেকে?" কত্তার হাঁ মুখ বন্ধ হতে চায় না| টিভির রিমোটটাও তো ঠিকঠাক টিপতে পারেন না গিন্নী সবসময়|

- "দূর ছাই, আমি শিখতে যাব কেন? টুবলু তো রাতদিন অনলাইন অর্ডার করে, ওর কাছেই শোনা| ও-ই করে দিয়েছে।" ওহো, এটা মাথায় আসা উচিত ছিল | বাড়ীর দুটো স্মার্টফোনের একটা পাকাপাকিভাবে বাবলি আর টুবলুর দখলে| বাবলির হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা চলছিল এই কিছুদিন আগেও, এখন সেসব অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি | ফিজিক্সে বরাবরই একটু নড়বড়ে মেয়েটা, তাই মনে মনে নিশ্চয়ই চেয়েছিল ওই পরীক্ষার আগে কয়েকদিন ছুটি | সেই প্রার্থনা যে এভাবে পূরণ হবে কে ভেবেছিল? চিন্তা হয় মাঝে মাঝে – এমন অনন্ত ছুটি পেয়ে ছেলেমেয়েগুলো হয়তো বেমালুম ভুলেই গেল যে তারা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার্থী | বাবলি তো পড়াশোনার নামও মুখে আনে না আর | সারাদিন খালি ঘরের দরজা বন্ধ করে কানে ফোন নিয়ে পুটুর পুটুর | জিজ্ঞেস করলে বলে বন্ধুর সঙ্গে নাকি কীসব ইম্পরট্যান্ট জিনিস প্র্যাক্টিস করছে | কত্তা বেশী ঘাঁটান না ওকে, শুধু বন্ধ দরজায় প্রাণপণে কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন ফোনের ওপ্রান্তের গলাটা 'হি' না 'শি'| বলা যায় না – এই বয়সের ছেলেমেয়েরা কতকিছুই তো 'প্র্যাক্টিস' করতে পারে | আর টুবলুর ক্লাস এইট | তার ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে লকডাউন শুরুর দিন থেকে | প্রথমে পাঁচ দিন, তারপর দশ দিন, তারপর আরো পনেরো – ভাইরাসের 'স্কোর' যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হচ্ছে ছুটিও | শেষে মোক্ষম খবরটা এল এই সেদিন | আর যেতেই হবে না ইস্কুলে, খুলবে এক্কেবারে গরমের ছুটির পর | তাহলে পরীক্ষা-টরীক্ষা? ওসবের কোনো বালাই নেই | সব্বাই পাস্ | নিশ্চয়ই ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের ছেলেরা মনে মনে বলছে, আহা, এমন ভাইরাস যদি বছরের পর বছর থাকে! শুধু ইস্কুল নয়, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও নাকি একই ব্যাপার – গরমের ছুটির পর খুলবে, আর সব্বাইকে এক সেমিস্টার এগিয়ে দেওয়া হবে| তার মানে এই অপ্রত্যাশিত লম্বা ছুটিতে তাদের কি আদৌ কোনো রীডিং অ্যাসাইনমেন্ট, হোমওয়ার্ক বা প্রজেক্ট থাকবে, না শুধু বসে বসে ভেরেন্ডা, খৈ ইত্যাদি ভাজলেই হবে? কে জানে! অবশ্য অ্যাসাইনমেন্ট দিলেই যে ছাত্রছাত্রীরা সুড়সুড় করে সুবোধ বালক বালিকার মতো সেগুলো করত তা নয়| তবে এই ছুটিতে যেহেতু পৃথিবী জুড়ে ফুটবল-ক্রিকেট বন্ধ, সিনেমা হলে সিনেমা বন্ধ, টিভিতে শুধুই পুরনো বস্তাপচা সিরিয়ালের পুনরাবৃত্তি, তাই একঘেয়েমি কাটাতে হয়তো দেখা গেল পড়াশোনায় দারুণ মন সবার|

যাকগে যাক, তরিতরকারির অনলাইন অর্ডারের ইতিবৃত্ত জানার জন্য টুবলুকে ডেকে পাঠিয়ে কথাপ্রসঙ্গে দুটো চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারলেন কত্তা | এক, লকডাউন শুরুর পর কয়েকদিন নাকি বাড়ীতে কাউকে না বলে সে তার পাড়ার ক্লাবের স্যাঙাতদের সঙ্গে সাইকেলে করে টহল দিতে বেরিয়েছিল লকডাউন লোকে কেমন মানছে দেখার জন্য | অসাধারণ! এরকম দায়িত্ববান নাগরিক যদি প্রত্যেকে হতো তাহলে কেসটা কী দাঁড়াত – ভেবে নির্বাক হয়ে যান কত্তা| একেই তো বাঙালির এখন বারো মাসে এক'শ তেরোটা পার্বণ, তার ওপর আবার এই লকডাউন উৎসবে লোকে দলে দলে সেজেগুজে রাস্তায় বেরোলে ভাইরাস বোধহয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে "নিকুচি করেছে চীন-আমেরিকা-ইউরোপের" বলে ওসব জায়গা ছেড়ে এই বঙ্গদেশেই স্থায়ী আস্তানা গেড়ে ফেলত| ভাগ্যিস ভাইরাসটা চোখে দেখা যায় না | নাহলে সেটা দেখতে হয়তো থিম-পুজোর প্রতিমাদর্শনের মতো ঠেলাঠেলি করে লাইন লাগাত বাঙালি | দুনিয়া কাঁপানো সেলিব্রেটি বলে কথা | দ্বিতীয় চমকপ্রদ তথ্যটা হ'ল, তাঁদের পাশের পাড়া থেকে যে অঞ্চলটার শুরু তাকে নাকি রাজ্যসরকার করোনার 'স্পেশাল হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে আর তাকে ঘিরে চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ প্রহরা বসানো হবে| মাছিটিও গলতে পারবে না | কেন? না, সেখানে এক হোম

ডেলিভারি বয়ের অনেকগুলো বাড়ীতে যাতায়াত ছিল, সে এখন ভাইরাস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি | তাই যে বাইশটা বাড়ীতে ছেলেটা যেত-আসত সেখানকার বাহাত্তর জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে | শুনে হৃদকম্প বেড়ে যায় কত্তার, আঁচাতে যেতে যেতে ছেলেকে বলেন একদম অনলাইনে ওসব কচুঘেঁচু অর্ডার না দিতে – মা যতই বলুক |

ভরপেট খাওয়ার পর একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছেটা ঠেকানো মুশকিল | এমনিতে এইসময় তো তিনি অফিসে – সেখানে আর গড়াবেন কোথায়? এই ভাইরাসের দৌলতে কর্মহীন হয়ে বাড়ী থাকতে থাকতে দিবানিদ্রার অভ্যেসটা গজিয়ে উঠেছে | আজ ঘুমের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন কত্তা | এক দৈত্যের হাতে তিনি বন্দী, আরও বাহাত্তর জনের সঙ্গে | ভয়াল দর্শন সেই দৈত্যের সারা গায়ে কাঁটার মতো খোঁচাখোঁচা | বন্দীদের সে লাইন করিয়ে শেকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে এক বধ্যভূমিতে | অনেকটা রাস্তা বন-জঙ্গল-ক্ষেত-খামার পেরিয়ে | কচুবনের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে গায়ে-হাতে-পায়ে চুলকুনি লেগে গেল, বেগুনক্ষেত পেরোতে গিয়ে সর্বাঙ্গে কাঁটার খোঁচায় রক্তারক্তি | শেষে গন্তব্যে পৌঁছে বন্দীদের একে একে একটা পেষণ যন্ত্রের মধ্যে ঢোকাতে লাগল সেই দৈত্য | পিষে ফেলতে লাগল তাদের | কী রক্ত জল করা শব্দ সেই পেষণ যন্ত্রের – ঝনঝন ঠনঠন দমাদ্দম | ঘুম ভেঙে যায় তাঁর | জোরে পাখা চলছে, তাও ঘেমে নেয়ে উঠেছেন | কিন্তু একী! ঘুম ভেঙেও সেই পেষণ যন্ত্রের শব্দটা কেন যাচ্ছে না? চারদিক থেকে এখনও ঝনঝন ঠনঠন দমাদ্দম –

ধড়মড় করে উঠে বসে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর | ও হরি, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল – এখন তো দেশজুড়ে থালাবাসন বাজানোর সময়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ডাকে | কিন্তু তার সঙ্গে উলুধ্বনি আর শাঁখের শব্দও কানে আসছে যে! এরমধ্যে আবার কারো বিয়ে নাকি? তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা গায়ে গলিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান তিনি | চারপাশের সব বাড়ীর একতলা-দোতলা-তিনতলার বারান্দায় দেশভক্ত মানুষেরা | তারা তাদের দেশ-নেতার নির্দেশের এক কাঠি ওপর দিয়ে গিয়ে থালাবাসনের সঙ্গে টিনের ক্যানেস্তারা, কাঁসরঘন্টা, শাঁখ, ঢোল – হাতের কাছে যা পেয়েছে সবই বাজাচ্ছে | যারা কিছুই পায়নি তারা উলু আর সিটি | এক অভাবনীয়, অশ্রুতপূর্ব অর্কেস্ট্রা | শুধু তাই নয়, টুবলুর ক্লাবের ছেলেগুলো আবার কোথা থেকে কালিপটকা, ধানিপটকা আর চকলেট বোমা জোগাড় করে এই ঘোর চৈত্রমাসে রীতিমতো দিওয়ালী লাগিয়ে দিয়েছে | একটাই তফাৎ – আসল দিওয়ালীর আগে থাকে ভূতচতুর্দশী, তখন ঘরে ঘরে আলো নিবিয়ে চোদ্দ প্রদীপ জ্বালা হয় | এক্ষেত্রে সেটা আসছে পরে – এই সপ্তাহেরই পরের দিকের কোন এক দিনে রাত নটার সময় বিজলী বাতিটাতি নিবিয়ে ন'মিনিট মোমবাতি আর প্রদীপ জ্বেলে বারান্দায় দাঁড়ানোর ফরমান জারি হয়েছে | কত্তার জন্ম উত্তর বঙ্গের ডুয়ার্সে, ছোটবেলাও কেটেছে সেখানেই | আজও মনে পড়ে রাত্রিবেলা বুনো হাতির পাল তাড়াতে গ্রামের লোকেদের মশাল জ্বালানো আর ক্যানেস্তারা পেটানো | ভাইরাসও যে শব্দ করে আর আগুন জ্বালিয়ে তাড়ানো যায় সেটা না দেখলে বিশ্বাস হতো না | প্রকৃতির কী বিচিত্র লীলা! পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর জীব আর ক্ষুদ্রতম জীবাণু – কী মিল তাদের মধ্যে!

সেই শব্দব্রহ্ম কানে নিয়ে বারান্দা ছেড়ে ডাইনিং স্পেসের সোফাটায় এসে বসেন কত্তা | টিভির রিমোটটা টিপে দেন | টিভিতে এখন চব্বিশ ঘন্টা একটাই আলোচ্য বিষয়, তাই সেটা শোনবার আশা করেই খুলেছিলেন | কিন্তু তাও খবরের নতুনত্বে চমকে গেলেন | দেখাচ্ছে খড়্গপুরের কোন এক তেলেভাজার দোকানে নাকি করোনা ভাজা পাওয়া যাচ্ছে | মানে করোনার মতো দেখতে বেসনের খোঁচাখোঁচা গোল ফুলুরি | আর কলকাতার এক মিষ্টির দোকানে লোভনীয় করোনা সন্দেশ | দেখতে দেখতে একটা জিনিস ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কাছে | সারা পৃথিবীকে কাবু করলেও বাঙালিকে কিস্যু করতে পারবে না এই ভাইরাস | কারণ প্রথমতঃ জোড়াসাঁকোর নোবেল লরিয়েট এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহুদিন আগেই বাঙালি জাতিকে সাবধান করে গেছেন তাঁর গানে – "একদিন চিনে নেবে তারে"| তাই চীনের মোকাবিলায় আগেভাগেই তৈরী হতে পেরেছে তারা | চীনের এই করোনা ভাইরাসের ধাক্কায় সবকিছু করা বন্ধ হয়ে গেছে বলে সারা বিশ্ব হাহুতাশ করছে, কিন্তু বাঙালি? একদমই না | বাচ্চাবেলা থেকে বুড়ো বয়স অবধি হাজারবার 'করোনা'-র মুখোমুখি হতে হতে জাতিগত ইমিউনিটি তৈরী হয়ে গেছে তার | "দুষ্টুমি করোনা", "বাঁদরামি করোনা", "হুটোপাটি করোনা", "উঠতে দেরী করোনা", "পড়ার সময় খেলা করোনা", "বাসে ঝোলাঝুলি করোনা", "পরীক্ষায় টোকাটুকি করোনা", "যারতার সঙ্গে প্রেম করোনা", "ফালতু ঝামেলা করোনা", "শরীরের অযত্ন করোনা" – ইত্যাদি শুনতে শুনতে "করোনার" অ্যান্টিবডিতে টইটম্বুর হয়ে রয়েছি আমরা |

আমাদের মারে কে? তবে হ্যাঁ, একটা আশংকা রয়েই যাচ্ছে | চীনেরা যদি এরপর কোনোদিন "খেয়োনা" বা "আড্ডা মেরোনা" ভাইরাস ছেড়ে দেয় বাজারে, তার ধাক্কা আমরা সামলাতে পারব কি? খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা মারা বন্ধ হয়ে গেলে বাঙালির বাঙালিত্ব বলে কিছু থাকে নাকি?

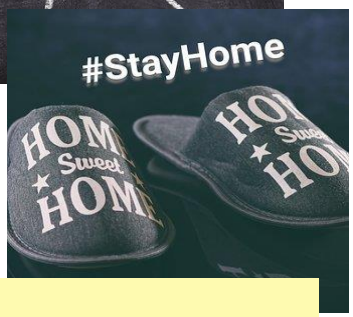

ঠিক তোর মতন...

অর্চিষ্মান বাগচী

মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "বাবা, দেখো তো কে এসেছে, মনে হয় তোমায় চাইছে |"

বইয়ের পাতায় ডুবে ছিলাম, শুনে মনে হ'ল ঠিক কথা; কলিং-বেলের একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম মনে হয় | কে আর, নিশ্চয়ই কোনও ছাত্রের বাবা-মা হবেন | ধীরেসুস্থে নেমে এসে তোকে দেখে চোখদুটোকে একদম বিশ্বাস করতে পারলাম না | "তুই, তুই এখানে? স্যান হোসেতে?... বাপরে ভাবতেই পারছি না রে!" আর তুই হাসছিলি নিশ্চুপে | তোর আয়ত চোখদুটির উপরে কপালের ঘামেভেজা কেশচূর্ণ লেপটে রয়েছে | গোটা মুখটা ঝলমল করছে খুশিতে, প্রিয় মানুষকে কোন বড়সড় সারপ্রাইজ দেবার খুশি | হাতে বড় একটা হ্যান্ডব্যাগ আর একটা লাগেজ পায়ের কাছে চুপচাপ শুয়ে | তোকে দেখে মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে কোনও জানলা দিয়ে যেন ঝিকিমিকি এক ঝলক রোদ্দুর ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছে | তুই বললি, "দেখো না, ক্যাব ড্রাইভার যে কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না | দেশী পাঞ্জাবী মানুষ | তুমি একটু ভাড়াটা মিটিয়ে দেবে?" আমি বাধ্য ছেলের মতো ড্রয়ার থেকে ওয়ালেটটা হাতে নিয়ে বেরোলাম |

দরজা পেরোতেই দেখি, ওমা এ তো আঙ্কেল! দশ গুণের উপর আরো দেড়গুণ আনন্দ নিয়ে এগিয়ে গেলাম আঙ্কেলের সবুজ ক্যাবটার দিকে | কাছে যেতেই আঙ্কেল ক্যাব থেকে নেমে বুকে জড়িয়ে ধরলেন – "বেটা খুস হো, দেখো ক্যায়সে পৌঁছ গয়ে তুমহারা নয়া ঘর...|" সেই চেনা ছ'ফিট লম্বা ছিপছিপে শরীর, খেটে খাওয়া দুটো রুক্ষ হাত | কোমলতম মনের একটি মানুষ | প্রায় নয় বছরের দীর্ঘ অদর্শন |

"আন্টি ক্যায়সি হ্যায়? ইয়াদ ভাই, ভাবী, গুড়িয়া?" এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে চলি |

"বাহে গুরুজীকে কিরপাসে সব চাঙ্গা | উও গুড়িয়া? অভি উও লেড়কি সাতমা ক্লাসমে পড় রহে হ্যায় |"

সত্যি সময় কী দ্রুতই না চলে যায়! সুখের সময়, দুঃখের সময়...| যেন এই দুদিন আগেই ইয়াদভাই, অমিত, সুধীর, আমি – সব একসঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম | কথা বলতে বলতেই আঙ্কেল ট্রাঙ্ক খুলে আর একটা স্যুটকেস বার করে আমার হাতে দিলেন | টাকা দিতে গিয়ে সেই প্রথম দিনের মতো আটকে গেলাম | উনি বাঁ

হাত তুলে বললেন, "আজ ইতনা রোজ বাদ মিলা, গুরুকে কিরপাসে মন ভর গয়া | ম্যায় তুমহারা আন্টিকো সাথ লেকে জলদি ওয়াপস আ যাউঙ্গা | বেটা, বহুত পুরানা হিসাব হ্যায়, উস দিন সব একসাথ বৈঠকে কর লুঙ্গা | বেফিকর রহো |" চলে গেলেন কিছুই না নিয়ে | একটা ছোট কাগজে আমার সেলফোন নম্বরটা শুধু টুকে নিয়ে গেলেন |

ঘরের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি তুই এতক্ষণ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলি | কী কান্ড! খুব লজ্জা পেলাম | তোকে এইরকম দাঁড় করিয়ে রেখেছি... সাত সমুদ্র পার করে যে এসেছে! কোনো মানে হয়?

"উনি তোমার চেনা মানুষ?"

"খুব" বলে তোকে টেনে এনে সোফাতে বসলাম | "পা তুলে বোস" হুকুম জারি করে এক গ্লাস জল নিয়ে হাজির হলাম তোর সামনে | তোর পিপাসা পেয়েছিল, দু-তিন চুমুকে শেষ করলি জলটা | আমি তোর সামনের সোফায় বসে একদৃষ্টে তোকে দেখছি | একটু ক্লান্ত তো হবিই | ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তোর | ভীষণ উত্তেজিত তুই, বুঝতেই পারছি | আমার উত্তেজনার পরিমাপটা বুঝতে পারছি না এখনও, মাথাটা গুলিয়ে গেছে | কী যে ভাল লাগছে তোকে কাছে পেয়ে! কী মিষ্টি দেখাচ্ছে তোকে! চিবুকের কাছে ছোট্ট কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে |

"চা করি?" বলে কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই রান্নাঘরে গিয়ে দুকাপ জল নিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম মাইক্রোওয়েভে | চার মিনিটে দুকাপ চা তৈরী |

কাপে চুমুক দিতেই তোর মুখটা বেঁকে গেল – "ইশ, কী বাজে চা করেছ তুমি!"

আমি হা হা করে হেসে উঠে বললাম "তাহলে এটা পচা চা!" তুই মুখে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বললি, "দাঁড়াও, আমি সঙ্গে করে দেশের চা-পাতা এনেছি, এরপর যখন করে খাওয়াব; তখন মানবে তোমারটা সত্যিই 'পচা চা' |"

আমি কৌতুক করে বললাম, "না খেয়েই মানছি রে! এবার বল কী খবর, তুই হঠাৎ?"

তুই সোফা থেকে উঠে খালি কাপ হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললি, "হুঁ, সব কথা খুলে বলব | একটু সবুর করো, এখন তো আছি দিন কয়েক | মাথাটা যেন একটু ধরেছে, স্নান করতে হবে | তোমার এখানে তো তেমন শীত নেই!"

বললাম, "এটা তো শীতের সময় নয়, এপ্রিল শুরু হওয়ার মুখে, বসন্ত এসে গেল | কিন্তু তুই দরজায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"|

মুখে কিছু না বলে তুই শুধু একটু ভ্রূভঙ্গি করলি | বাচ্চাকে প্রশ্রয় দেওয়া সার্বজনীন মাতৃমুখ | একটুও খুশি হলি কিনা বুঝতে পারলাম না | রান্নাঘরের সিঙ্কে কাপদুটো নামিয়ে না রেখে নিজেই সাবান, স্পঞ্জ খুঁজে নিয়ে ধুয়ে রাখলি | আমিও বাধা দিলাম না | এই করেই তুই নতুন জায়গাতে সহজ হয়ে উঠবি | ফিরে এসে এবার না বলতেই পা দুটো তুলে একটু আরাম করে সোফাতে বসলি তুই | একটা ছোট্ট হাই তুলে বললি, "সত্যি, শেষবার যখন দেশে আমার বাড়িতে তুমি এলে, সে কী ঝটিকা সফর! বাবুকে দশ মিনিটের বেশি দেখতে পেলাম না | এক কাপ চা পর্যন্ত..."

আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে থামালাম, "বাঃ, ও নিয়ে তো আগেই কথা হয়েছে রে, আমি তো তোর ওখানে চা খেতে যাইনি | শুধু তোকে দেখব বলে গিয়েছিলাম |"

এবার তোর মুখ দেখে বুঝলাম তুই খুশি |

"আমি বলছিলাম, তবে আমার বাঁধিয়ে রাখার মতো ভাগ্য | কোথায় তোর সঙ্গে বসে আধঘন্টা মধুর আলাপ করব, না তুই একটা পিংপং বলের মতো লাফালাফি শুরু করলি | আর আমি তোর শাশুড়ী ঠাকরুনের সঙ্গে বসে গল্প করে গেলাম | আরো কয়েকবার এরকম চললে আমিই ওঁর বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে উঠব | তখন বুঝবি মজা!"

দেখা গেল তুই একদমই ভীত নোস | হাসতে হাসতে বললি, "হবে কি গো, হয়ে গিয়েছ | এই তো সেদিন উনি তোমার গল্প করছিলেন নিজের এক বন্ধুর কাছে | বেশ ইমপ্রেসড বলেই মনে হ'ল |"

আমি কথার মাঝে মনে করালাম, "এই তুই স্নানে যাবি না? আমি তোয়ালে বার করে দিচ্ছি; স্নান করে ডালভাত খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দে, শরীর অনেক ঝরঝরে হয়ে যাবে | তোর স্নানের সময় আমি একটু স্যালাড কেটে রাখব | মুখে স্বাদ পাবি |"

তুই আড়মোড়া ভেঙে বললি, "সব হবে | তোমার বাড়িটা আগে একটু ঘুরে দেখে নিই, অন্তত নিচতলাটা |" বলে লিভিং রুম, ফর্মাল স্পেস, লন্ড্রি রুম – সব ঘুরে ঘুরে দেখে ফেললি | আমার কি-বোর্ডটা দেখে একরাশ প্রশ্ন শুরু করলি – কে কে বাজায় ইত্যাদি | তারপর ফ্রেঞ্চ দরজাটা খুলে বাইরে ব্যাক ইয়ার্ডে চলে গেলি | ভীষণ এলোমেলো আর নোংরা হয়ে আছে বাগানটা | শুকনো পাতা পড়ে আছে চারদিকে | আমার একটু লজ্জাই লাগছিল | তুই অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলি – বললি,

"বাড়ির সঙ্গে একটু ফাঁকা জায়গা থাকলে কী ভাল লাগে না!" কাঠের বেঞ্চিটার দিকে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে রইলি | তারপর

শান্তভাবে বেড়ার পূর্বকোণটা দেখিয়ে বললি, "ওখানে একটা হলুদ ফুলের গাছ লাগাবে, পড়ন্ত রোদ্দুরে খুব সুন্দর লাগবে দেখতে; পরের বার এসে দেখব |" বলে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালি আমার দিকে | আমি মনে মনে উচ্চারণ করলাম ঠিক লাগাব রে, আর 'হ্যাঁ' সূচক ঘাড় নেড়ে বাধ্যতা জানালাম |

এবার হঠাৎ তোর কী যেন মনে হতে তুই দ্রুতপদে বাড়ির ভিতরে ঢুকলি, আমিও তোর পিছন পিছন | হুকুম করলি, "বসে পড়ো তো সোফাটায় চুপটি করে |" ব্যস্তহাতে ব্যাগ থেকে চাবি বার করে স্যুটকেস খুলে এদিক ওদিক কীসব টান মেরে বার করতে শুরু করলি | তারই মধ্যে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দিলি | "একটা জিনিস এনেছি তোমার জন্য, একটু চোখ বন্ধ করবে...?"

চোখ বন্ধ করেছিলাম | তার ঠিক আগেই দেখেছিলাম মুখে রাজেন্দ্রাণীর হাসি নিয়ে তুই এগিয়ে আসছিস আমার দিকে | তোর হাতের মুঠোতে কী যেন একটা ধরা আছে | তোর হলুদ পোশাকের প্রান্তগুলো হাওয়ায় কাঁপছে আর পড়ন্ত সূর্যের আলো মেখে ঝলমল করছে সবটুকু | ওইই ব্যস | তারপরে চোখ বন্ধ করলাম |

তার পরে... তারপর যখন চোখ খুললাম, দেখলাম সব পাল্টে গেছে | মুহূর্তে বুঝতে পারলাম তুই কোথাও নেই | ওসব নেহাতই আমার কল্পনা ছিল | আর অনুভব করলাম বাড়িময় ছড়িয়ে রয়েছে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা |

এর দুদিন পরে বিকেলের আলোয় ব্যাক ইয়ার্ডের বেঞ্চিতে বসে স্বরচিত চা খাচ্ছি | আর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে এলোমেলো চিন্তা | নতুন বসন্তের মলয় মরুৎ মন্দ মন্দ মন্দ! তিনটে কাঠবেড়ালি এ ডাল থেকে ও ডাল ছটফট করে চরে বেড়াচ্ছে | হঠাৎ কারো অঙ্গুলি নির্দেশে বেড়ার পূর্বকোণের দিকে নজর গেল | কী আশ্চর্য! দেখি একটা ফুলের গাছে হলুদ ফুল উপচে পড়ছে | হাওয়ায় দুলছে তারা, আর গ্রীবা বেঁকিয়ে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে যেন! বিদায়ী সূর্যের ছটায় সোনার মতো জ্বল জ্বল করছে সেই ফুলগুলো | খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ নিলাম তাদের | অস্ফুট উচ্চারণ করলাম, 'ভালবাসি' | এমনিতে ফুলের নামের ব্যাপারে আমি একেবারেই পণ্ডিত নই, কিন্তু কেন জানি না মনে হতে লাগল, এই ফুলেদের নাম আমি নিশ্চিত জানি | এরা যে আমার অনেকদিনের চেনা!

•••••✹•••••

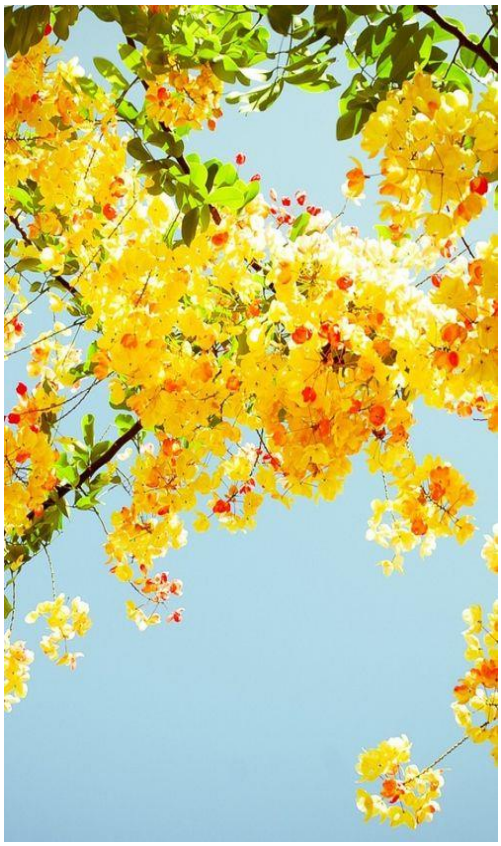

সিম্ফনি

দেবব্রত তরফদার

ফাদার জনাথন কদিন ধরেই লক্ষ্য করছেন ছেলেটাকে | বয়স তো অনেকেই হ'ল তাঁর | আর্জেন্টিনার এক ছোট শহরে জন্ম, সাত ভাইবোনের সবাই যীশুর স্মরণে | সবাই ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে |

বাবা বাজাতেন ভায়োলিন | এটাই ছিল রুটি রুজির পথ। একে একে সব ভাইবোন মিশনে গেল | মা বাবা ভেবেছিলেন ছোট ছেলেটি বাবা এবং ভায়োলিনের এত ভক্ত যে একে হয়তো সংসারে বেঁধে রাখা যাবে, কিন্তু সেও দাদা দিদিদের পথ বেছে নেয় | প্রথমে অস্ট্রেলিয়া পরে ইতালি হয়ে যখন ভারতে আসেন তখন এই দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে | যীশুর বাণী প্রচারের জন্য যাজকরা এদেশে আসতে শুরু করেছেন অনেক আগে থেকেই | উত্তর পূর্ব ভারতে এঁরা ধর্মপ্রচারে এগিয়েছিলেন অনেকটাই |

জনাথন প্রথম এদেশে এসে শিলং-এ এক মিশনের প্রধান ফাদার হিসাবে নিযুক্ত হন | তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠায় | মিশনের কনভেন্ট স্কুলের মিউজিক টিচারের দায়িত্ব নেন তিনি | ফাদার জনাথনের শিলংয়ের জল একেবারেই সহ্য হ'ল না | তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল | তারপর মিরিক, কৃষ্ণনগর, প্যারিস ঘুরে বেহালার অক্সফোর্ড মিশনে স্থিতু হলেন ষাটের দশকের প্রথমদিকে | এই মিশনে অনাথ বা প্রায় অনাথদের আবাসিক স্কুল আছে | খ্রীষ্টান মিশনগুলি পুরোপুরি অরফানেজ নয় | অনাথ ছাড়া একদম প্রান্তিক পরিবারের শিশুরাও এখানে থাকে | লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধূলা গানবাজনাও চলে |

বাবার কাছে ভায়োলিন শিখেছিলেন তিনি পরে অর্গান পিয়ানো আর চেলো বাজনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন | বর্তমানে সত্তরোর্ধ্ব মানুষটির বেশিরভাগ সময় কাটে মিউজিক রুমে | কত বছর আগে দেশে গেছেন মনেই পড়ে না | দাদা দিদিদের মধ্যে অনেকেই নেই | ভাবেন ভারতেরই কোনো এক গ্রেভ ইয়ার্ডে শান্তির ঘুম ঘুমাবেন তিনি | তাঁর পোশাক আশাক অদ্ভুত, ফাদার গাউন পরেন না, প্যান্টের উপর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, মুখে তামাটে দাড়ি, বাংলা বলেন স্পষ্ট উচ্চারণে |

ফাদার জনাথনের অনেক ছাত্র ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন মিউজিক স্কুলে | কেউ কেউ পেশাদার বাজিয়ে | দক্ষ ছাত্রদের এডিনবরো স্কুল অফ মিউজিক থেকে ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে | একটা ভাল ছেলে পেলেই তাকে নিয়ে পড়ে থাকেন জনাথন |

ষাটের দশকের শেষ দিক | নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়নি তখনও, কিন্তু বরিশাল অক্সফোর্ড মিশন স্বাধীনতার পর থেকেই বিচ্ছিন্ন |

এখন বড়দিনের ছুটি, স্কুল প্রায় ফাঁকা, শুধুমাত্র যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, তারাই এখন স্কুলে | বছর দুয়েক আগে দুটি বাচ্চা ভর্তি হয়েছে আরো কয়েকজনের সঙ্গে | এদের একটি নদিয়ার চাপড়ার অনুপ মন্ডল | কৃষ্ণনগর ডন বস্কো জুনিয়র স্কুল থেকে এসেছে | মিউজিকে দক্ষতা দেখে ফাদার লুচান্নর হাত ধরে এখানে | আর, কোন একটি অনাথালয় থেকে বেণুগোপাল রায়, বাবা মা নেই | অনুপের পিয়ানো, অর্গানের হাতেখড়ি হয়েছিল ফাদার লুচান্নর কাছে | বেণুর পরিচয় হয়নি কোনো বাজনার সঙ্গে | কিন্তু মিউজিক ক্লাসে তার তন্ময়তা দেখে অবাক হন জনাথন | একটি বেবি ভায়োলিন পেয়েছে সে | চুপচাপ শান্ত ছেলে, লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই | যে কোনো সুর যে কোনো শব্দ তাকে আকর্ষণ করে | বেহালার এই দিকটা প্রায় গ্রামের মতো, অজস্র গাছপালা মিশনে | বেণুগোপাল হয়তো কোনো পাখির ডাক শুনতে শুনতে এতটাই তন্ময় হয়ে যায় যে ক্লাসের পড়া তার কানে ঢোকে না | শাস্তিও জোটে কপালে | সবসময়েই সে মিউজিক রুমের আশে পাশে ঘুরঘুর করে | ফাদার জনাথন কিছু বাজালেই ছুটে আসে, তন্ময় হয়ে শোনে | কিন্তু মিশনে আবাসিকদের কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে কাটাতে হয়, এই কারণে অনেক সময় নিয়ম ভঙ্গ হয়, শাস্তিও পেতে হয় | প্রশ্রয় দেবার কারণে ফাদার রেক্টর জনাথনের উপর অসন্তুষ্ট হন |

সময় চলতে থাকে | অনুপ আর বেণুগোপাল দুজনেই বড় হয় | পিয়ানো, ভায়োলিন, চেলো সবেতেই হাত চলে দুজনের | এদের মধ্যে অনুপ চটপটে, স্মার্ট কথাবার্তা ও পোশাক আশাকে | মিউজিক ছাড়াও অন্য বিষয়ে তার আকর্ষণ – নাটকের দলে মুখ্য ভূমিকায়, স্কুলের ফুটবল টিমে, তবে সহজাত দক্ষতায় সুর তার করায়ত্ত | এখন অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে চেলো তার ধ্যান-জ্ঞান | ফাদার জনাথন বুঝতে পারেন যে এ এক লম্বা রেসের ঘোড়া |

অন্যদিকে বেণুগোপালের কোনো পরিবর্তন হয়নি | সে আগের মতো নিজের ঘোরেই থাকে | তারও সব থেকে বেশি চেলোতেই

মন-প্রাণ, কিন্তু ভায়োলিনও ছাড়েনি | অনেক সময় রাতে ভায়োলিনের ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় কখনো কখনো, দূর থেকে ভেসে আসে | আবাসিক ছাত্ররা জানে বেণুগোপাল রাতে খাবার পর ভায়োলিন নিয়ে প্রাচীর টপকে বাইরে যায় | দারোয়ানের প্রশ্রয় আছে | কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে ফাদার রেক্টরের কাছে ধরা পড়ে যায় | হোস্টেলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে তাকে স্কুলে রাখা যায় না | আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো যুক্তি নেই | বৃদ্ধ জনাথন তার পক্ষ নিতে পারেন না | কিন্তু ফাদার রেক্টরের দয়ায় বেঁচে যায় সে |

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ হয় | ফাদার ওদের দুজনকে ডেকে বলেন, "ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফর্ম এনেছি | এই নাও বইপত্র, শুধু বাজালেই চলবে না পরীক্ষাও দিতে হবে | আমি তোমাদের ক্লাস নেব |"

ডিপ্লোমা পরীক্ষা পর্যন্ত মিশনে থাকার সুযোগ মেলে | সারাদিন প্র্যাকটিস, রাতে পড়াশোনা | জনাথনের নিজের মতে তাঁর এই দুই ছাত্রের মধ্যে বেণুগোপালের বাজনায় দরদ অনেক বেশি | বাজানোর সময় সে বাজনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় | পরীক্ষা হয়, ফলও প্রকাশ হয় | অনুপ উত্তীর্ণ হলেও, বেণুগোপাল থিওরিতে ফেল |

এর একবছর পর মিউজিক স্কলারশিপ নিয়ে অনুপ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় | আর বেণুগোপাল পড়াশোনা ছেড়ে মিশনের এন জি ও-তে আজিমগঞ্জে | মুর্শিদাবাদের এই জায়গাটা একদম পিছিয়ে পড়া | বেণুগোপালের ভাল লেগে যায় এখানে | সাঁওতাল পল্লীতে ঘুরে ঘুরে কাজ করে | রাতে তাদের গান বাজনার আসরে যায় | সুখেন মুরুমু-র কাছে বাঁশি শেখে | কদিন পর দেখা যায় সাঁওতাল পল্লীতে নতুন বংশীবাদক | দু'বছর পর তাকে আর চেনা যায় না | মনে হয় সেও সাঁওতালদেরই একজন | ছেঁড়া বেলবটম প্যান্ট, জামাটাও সেরকমই | এখন আবার পানজর্দা খাওয়া ধরেছে |

একদিন দেখা হয় কৃষ্ণনগরের বন্ধু অ্যান্টনির সঙ্গে | সে এখন ডন বস্কো স্কুলের টিচার | বন্ধুকে দেখে বলে, "এ কী হয়েছে তোর চেহারা, আয়নায় নিজেকে দেখেছিস?"

বেণুগোপাল হাসে | ট্রেনে ফেরার পথে অ্যান্টনি ভাবে, কী প্রতিভাধর তার বন্ধুটি! কীভাবে নষ্ট হচ্ছে একটা জীবন! ভাবে ওকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যেতেই হবে |

ফাদার লুচান্ন এখন অতি বৃদ্ধ | তাঁর সঙ্গে কথা বলে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে একটি মিউজিক ক্লাস খোলা হয় কৃষ্ণনগর চার্চে | বেণুগোপালের নতুন আস্তানা সেখানে | আর বন্ধুর উদ্যোগে এখানকার আর সি পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধে সে | পাশেই মুক্তিনগরে মিশনের দেওয়া টালিছাওয়া ঘরে তাদের সংসার | দু'বছর পর শিশুর কলকাকলি | উঠোনে মুরগি চরে | চেলো আর ভায়োলিনের শ্রোতা কোথায়? মুখরা অভাবী বউটি সারাদিন গজগজ করে |

ওদিকে অনুপ স্কলারশিপ নিয়ে ভিয়েনা যাবার পরে ইংল্যান্ডে স্থিতু, একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে | লস এঞ্জেলেসে ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রায় জুবিন মেহেতার সঙ্গে প্রোগ্রাম করার পর বাঙালি চেলোইস্ট হিসাবে নাম হয়েছে খুব | আমেরিকা, ইউরোপের বড় বড় শহরে প্রোগ্রাম করে বেড়ায় | অনেক বছর পর একবার দেশে এসে বন্ধুর খোঁজ করে সে | চাপড়ার বড়দিনের মেলায় দেখা হয় দুই বন্ধুর | বেণুগোপালের অবস্থা দেখে চরম পেশাদার মানুষটিও আনমনা হয়ে যায় | বলে, "এবার পাসপোর্ট কর একটা, আমি তোকে ভিসা পাঠাব | তোর মতো শিল্পীর কদর করবে না এই দেশ |"

বেণুগোপালের মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি | "ভালই তো আছি |"

"একে ভাল বলে?" তার মলিন অবস্থা দেখে কষ্ট হয় অনুপের | এরপর বাজনা নিয়ে কথা হয় | চুপচাপ শান্ত লোকটি বলে, "আমি তোর একটা প্রোগ্রাম দেখেছি | তুই তো ভাই খুব একটা এগোতে পারিসনি, এক জায়গায় একটু গন্ডগোল হয়েছিল |"

– বলে সেই জায়গাটা উল্লেখ করে | অন্য কেউ হলে সাহসই পেত না | অনুপ হাসে, "ঠিক ধরেছিস, মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল, লন্ডনে লিন্ডা একা, বাচ্চাটি হাসপাতালে ভর্তি আর আমি তখন আমেরিকায় |"

দিন কাটে | মাঝে মাঝে বেণুগোপালকে দেখা যায় ভায়োলিন বা চেলো বগলদাবা করে কৃষ্ণনগর লোকালে | পয়সা বাঁচানোর জন্য তিন টাকা দিয়ে ভেন্ডারি কামরায় | কখনো চেকারের হাতে ধরাও পড়ে | একদিন স্টেট ব্যাংকে পুরনো এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয় | তার সঙ্গে তার একটি পাড়াতুতো দাদাও ছিল | ছাত্রটি নমস্কার করে বলে – "স্যার, কী ব্যাপার, কেমন আছেন?"

"এই একটা চেক ভাঙাতে এসেছি | তারপর একটা চিঠি দেখিয়ে বলে, মানিকদার চিঠি | চিঠিতে লেখা – "ভাই বেণুগোপাল, নতুন

কাজ শুরু করছি | তাড়াতাড়ি দেখা করো, তোমরা ছাড়া আমি অচল |"

ছাত্রের দাদার ওই হাতের লেখাটি খুব চেনা মনে হয় | সে বেণুগোপালকে জিজ্ঞেস করে, "কার চিঠি?"

একটু ইতস্তত করে বেণুগোপাল বলে – "মানিকদা, মানে সত্যজিৎ রায়ের | উনি শাখাপ্রশাখা নামে একটি সিনেমা শুরু করছেন |"

উপস্থিত যাদের কানে কথাগুলো যায় তারা চমকে ওঠে | অনেকেই অবিশ্বাসী চোখে তাকায় | উনি এবার চেকটা বার করে দেখিয়ে বলেন – "গণশত্রু সিনেমায় কাজ করেছিলাম | চেকটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, মানিকদা চেকে তারিখ লেখেন না তাই ভাঙানো যাবে | চেকের নীচে সেই বিখ্যাত সই | এবার ব্যাংকে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এমনকি ম্যানেজারবাবু নিজে এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে যান | এই ঘটনার পর এটাই কদিন এই শহরে বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে | চেলো বাজনা সম্পর্কেও অনেকেরই কৌতূহল দেখা যায় |

বেণুগোপাল এরপর কলকাতায় কয়েকটি মিউজিক স্কুলে পার্টটাইম কাজ পেয়ে যায় | সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা এসেছে | ভেরোনিকা, মানে অশিক্ষিতা, মুখরা বউটি এখন চুপচাপ | কখনো সে আনমনে দু'চক্ষের বিষ যন্ত্রগুলোর ধুলো ঝাড়ে | সংসারে আরো একটি প্রাণী এসেছে এর মধ্যে | সঙ্গীত বলতে সে বোঝে পাড়ায় মাইকে বাজা লতা, কিশোর, রফি, আশার গান | চেলোর ঘ্যাঙঘ্যাঙ বাজনা কি এখন তার কাছে মধুর মনে হয়? কে জানে! সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছে, তাঁর কোনো ছবি দেখেনি | সে জীতেন্দ্র, জয়া প্রদার ফ্যান | এবার সত্যজিতের একটা সিনেমা দেখাতে হবে ওকে |

বড় ছেলেটি খুব দুষ্টু, কিন্তু বাবার বাজনা শোনে তন্ময় হয়ে | একদিন কলকাতা থেকে একটি বেবি বেহালা আসে বাড়িতে | এক বছর পর ডন বস্কো স্কুলের পেরেন্টস ডে-তে ক্ষুদে এক বেহালাবাদক "ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী" বাজিয়ে সকলের মন কেড়ে নেয় | ভেরোনিকার দু চোখ ছাপিয়ে জল আসে |

অনেক রাতে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে মরা চাঁদের আলোয় বেণুগোপাল দেখে টালির চাল লাউফুলে ভরে আছে | উঠোনে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে | ঘরের ভিতরে চুড়ির শব্দ শুনে একটু অবাকই হয় | অন্যদিন তার ভাত ঢাকা থাকে | কিছু মনে করে না বেণুগোপাল | পৃথিবীর কোনো কিছুর বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই |

বারান্দায় উঠে দেখে ভেরোনিকা খাবার গরম করছে | দুজনের খাবার দেখে তার অবাক হবার পালা, কিন্তু মুখে কিছু বলে না | খেতে খেতে হঠাৎ ভেরোনিকা বলে, "জয়দীপের স্কুলে আজ অনুষ্ঠান ছিল | বড় ফাদার তোমার পরিচয় দিলেন | খোকা খুব ভাল বাজিয়েছে, কত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলারা আমার সঙ্গে পরিচয় করলেন | আমার একটু কুণ্ঠা বোধ হচ্ছিল | আমাদের বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বললেন | ক'টা ভাল কাপ-প্লেট কিনতে হবে, বুঝলে?" এক নিঃশ্বাসে বলে যায় | আজ সে খুব প্রগলভ, "তোমার দুটো শার্ট কিনতে হবে, কী সব যে পরে ঘুরে বেড়াও, কত বড় বড় জায়গায় যাও | লোকে বলবে – এই লোকটার বউ কী রকম, স্বামীর খেয়াল রাখে না, বর না হয় খ্যাপাটে!"

আজ ভেরোনিকাকে কথায় পেয়েছে | এরপর একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে, "দাড়িটাড়ি ঠিকমতো কামাতে পারো না? আর প্যান্টের কাটছাঁটও একটু পাল্টাতে পারো তো!"

বেণুগোপাল কিছু কিছু বুঝতে পারে বোধহয় | সে হাসে |

"কেন যে হাসো সবসময়, শরীর জ্বলে যায়, হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলো লোকটা!"

একথা দিনের মধ্যে বহুবার শোনে বেণুগোপাল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে আজ যেন ভায়োলিনের সুর |

শোবার ঘরে বড় খাটে ভেরোনিকা থাকে বাচ্চাদের নিয়ে | পাশের ছোট ঘরে বেণুগোপাল একা | বহুদিন এমনই ব্যবস্থা চলছে | বেণুগোপালের কোনো ব্যাপারেই অভিযোগ থাকে না কখনই | সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ ভরে আসে তার |

একটু পরে খসখস শব্দ, ফিসফিস কণ্ঠস্বর – "একটু সরো |"

বহুদিন পর | শেষ কবে যে ভেরোনিকা উদ্যোগী ছিল মনেই পড়ে না | সাপের শঙ্খ লাগার শব্দ কি ভায়োলিনে ধরা যায়?

অনেকদিন পর ভেরোনিকা বেপরোয়া | রাত শেষ হতে চলল, বেণুগোপালের ঘুম আসে না | ভেরোনিকা তাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে | ধীরে ধীরে তাকে সরিয়ে পরম মমতায় চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় বেণুগোপাল |

তারপর সন্তর্পণে বেহালাটা নামিয়ে আনে |

মিশনের সেই রাতে হয়তো কিছু বাকি ছিল | চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে | সামনের ঢালু জমিটা বেয়ে ন্যারোগেজ রেল লাইনের দিকে নেমে যায় | অসময়ে কোথায় যেন কোকিল ডাকছে |

বেণুগোপাল একটু দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক শোনে, তারপর ভাবে কত সুর ভায়োলিনের তারে ধরা দেয় না!

(আমার ভাই, সন্দীপের মিউজিক টিচার মৃদুল রায় ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যজিৎ রায়ের শেষ দিকের সবকটি সিনেমায় তিনি কাজ করেছিলেন। ওঁর টুপিতে এই একটিই পালক।
পৃথিবী বিখ্যাত চেলো শিল্পী অনুপ মন্ডলের নাম ধাম বদলাইনি। সন্দীপের অনুরোধে এই লেখা।)

থেরাপি

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

ন্যাড়া বেলতলা আর পোড়া বাদামতলা দুটি নচ্ছার গ্রাম। ডুমুর বাগান থানা এলাকার ম্যাপের মধ্যে এই দুটো স্পটে লাল ফুটকি দেওয়া আছে। ডেঞ্জার এরিয়া। চার্জ বুঝে নেবার দিন বিদায়ী ও.সি, নিরাপদ সামন্ত বারবার সেকথা বললেন। বললেন, ঠিকমতো সামলাতে না পারলে বদনাম হয়ে যাবে। আরে বদনাম তো হয়েইছে। সারা জীবন এ পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাটিয়ে এই ডুমুর বাগান থানা যার আন্ডারে ন্যাড়া বেলতলা আর পোড়া বাদামতলা, তাঁর কেরিয়ারে ব্ল্যাক স্পট হয়ে রইল! গত বছর ঠিক জুলাই মাসে বিরাট বোমাবাজি হ'ল পরপর দুটো গ্রামেই। একজনকেও অ্যারেস্ট করা গেল না। তদন্তে উঠে এল কিছু নাম। কিন্তু প্রমাণ কোথায়! তার ওপর পুলিসকে নিয়ে কী হেনস্তাটাই না করা হল! পুলিস কি কারও বাপের চাকর! নিরাপদ দারোগাকে বোকা বানানো! পুলিসকে নিয়ে ঠাট্টা!
ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি। –

ডুমুর বাগান থানায় একটা ফোন এল – জগন্নাথ ঘোড়ুইয়ের বাড়িতে নাকি জ্বালানী কাঠের মধ্যে গাঁজা আর হেরোইন লুকানো আছে! সে-কী-! গাঁ-আ-জা-আ! হে-রো-ই-ন! বলেই নিরাপদ দারোগা প্রায় ভিরমি খান আর কি। কিন্তু সমস্ত জ্বালানী কাঠগুলো টুকরো টুকরো করেও কোথাও এক ছটাক গাঁজা বা হেরোইন কিছুই পাওয়া গেল না।

এর ঠিক পরে পরেই দুয়েকদিনের মধ্যেই থানায় আর একটা ফোন এল। শ্যামাচরণের পালের বাগানে নাকি সোনার বার বিস্কুট আর চোরাই হীরে লুকানো আছে। সো-ও-না আ-র বিস্কুট! চোরাই হী-ই-রে! বলে নিরাপদ ছুটলেন দলবল নিয়ে। কিন্তু সমস্ত বাগান খুঁড়ে তন্ন তন্ন করে দেখেও কিছু পাওয়া গেল না।

রিপুদমন ধর কনস্টেবল থেকে প্রমোশন পেতে পেতে দারোগা হয়েছেন। তিনিই এবার থানার চার্জে আসছেন। নিরাপদ দারোগা তার বদলীর আগেই রিপুদমনকে সব ঘটনা বলে গেলেন এবং জগন্নাথ এবং শ্যামাচরণ এই দুটি চরিত্রর ওপর কড়া নজর রাখার পরামর্শও দিয়ে গেলেন। নিরাপদ-এর খবরের সূত্র তলাপাত্র। ঘটনা এই যে, নিরাপদ সেদিন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মেজাজ খারাপ করে থানায় বসে আছেন। দাঁত বের করে হাসতে

হাসতে থানায় এসে ইনফর্মার তারক তলাপাত্র এমন খবর দিয়ে গেল যে মেজাজ আরও খারাপ না করে উপায় কী! জগন্নাথ আর শ্যামাচরণ দুই গ্রামের দুই মহা ধড়িবাজ | ওরাই সাঁট করে একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যে ফোন করেছিল | কিন্তু উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না | কাউকে তেমন বলার মতো ব্যাপার নয় এটা | পুলিসকে বোকা বানানোর গল্প, কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া উপায় নেই | এমন সময়ে ট্র্যান্সফার অর্ডারটা চলে আসায় তিনি আর পাঁচটা কাজের মধ্যে এ নিয়ে বেশি এগোনোর সময় পাননি | তবু নিরাপদ জনান্তিকে সব কথাই রিপুদমনকে বলে গেলেন | উদ্দেশ্য একটাই; যাতে নতুন দারোগা এই অপমানের শোধ তুলতে পারেন |

রিপুদমনকে দেখে চট করে কোন ভয়ের উদ্রেক হয় না | গোলগাল হাসিখুশি চেহারা | শিওর হবার জন্য নিজের মতো তদন্ত শুরু করলেন | হাসতে হাসতেই তিনি থানার ল্যান্ড ফোনের কল লিস্ট দেখতে শুরু করলেন | দিন তারিখ মিলিয়ে ওই দুটি টেলিফোন নম্বরকে চিহ্নিত করা হ'ল | কিন্তু যেটা আশা করা গেছিল সে প্রমাণ কিছুতেই সরাসরি মিলল না | ঐ দুটি টেলিফোনের কোনটাই জগন্নাথ বা শ্যামাচরণের নয় | দুটি টেলিফোন নম্বরই ন্যাড়া বেলতলা আর পোড়া বাদামতলা পোস্ট অফিসের পাবলিক টেলিফোনের | সন্দেহজনক কেউ তাঁর হাতে পড়লে সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করে পালাবার পথ পায় না | তিনি যে লক-আপে খুব একটা শারীরিক অত্যাচার করেন এমন নয় | তবে তাঁর একটি বিশেষ থেরাপি আছে | কিন্তু আগে তো কনফার্ম হতে হবে, তারপর তদন্ত শেষ করে, থেরাপিতে সত্য উদ্ঘাটিত হবে |

দুই

খুব তড়পাচ্ছিল দুজনেই, জগন্নাথ আর শ্যামাচরণ | খুব বড় বড় কথা দুজনের |

উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা নিম্নরূপ –

রিপুদমন দুজনকেই সমাদর করে বসিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, - কী খাবেন? চা, না কফি?

- চা খাবার জন্য এত সকালে কনস্টেবল পাঠিয়ে ধরে এনেছেন? ব্যাপারটা কী? মগের মুলুক?

খুব সংকোচের সঙ্গে নতুন দারোগা জবাব দিলেন, - না, আপনাদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ধরে এনেছি |

- কীসের স্বীকারোক্তি? চার্জটা কী?

- পুলিসকে খামোখা হ্যারাসমেন্টের স্বীকারোক্তি | আর চার্জ? না না, কোন চার্জ আপনাদের দিতে হবে না | থানার লক-আপে থাকার জন্য কোন চার্জ লাগে না | গোটাটাই পরিষেবা | এক্কেবারে ফ্রি – থাকা খাওয়া; সরকারী অতিথি | অপরাধ স্বীকার করলে আপনাদের সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে | বিরোধিতা বা তর্ক করলে ভুগবেন কিন্তু | দেরি করে অপরাধ স্বীকার করলেও শাস্তি পেতে হবে |

- আপনি এটা করতে পারেন না | আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমরাই অপরাধ করেছি |

না, রিপুদমনের হাতে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই | কিন্তু পোস্ট অফিসের আশেপাশে ঘটনার দিনে যে অভিযুক্তদের ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল, সেটা স্থানীয় তদন্তেই প্রমাণিত হয়েছে | আসলে মোটিভটা কী, এ নিয়েই ধন্দ আছে | পুলিসকে ভুল খবর দিয়ে হয়রানি করার কারণটা খুঁজে বের করতে পারলেই গোটা বিষয়টার ব্যাখ্যা মিলবে | কেসটা দাঁড়াবে | এই কারণটা কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না রিপুদমন দারোগা | তদন্তে সহায়তা করছে সেই ইনফর্মার তারক তলাপাত্র | আপাতত তাই তিনি নিশ্চিত এবং নানাভাবে দুই অভিযুক্তকে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন | কিন্তু প্রাথমিকভাবে চেষ্টা ফলবতী হ'ল না | তখনই সেই বিশেষ থেরাপি শুরু হ'ল |

- আহা, কী করেন, কী করেন ছেড়ে দ্যান মাইরি | কাতুকুতু লাগে যে!

হ্যাঁ, রিপুদমনের শমন দমন উপকরণ আসলে আর কিছুই নয় – কাতুকুতু থেরাপি | প্রচণ্ড কাতুকুতু দেন | পেটে আর পাঁজরায় আঙুলটা স্পর্শ করলেই অভিযুক্ত হাসতে থাকে | প্রাণখোলা হাসি | অথচ মনে মনে বলে ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি | শেষকালে এমন হয় যে কাতুকুতু দিতেও হয় না | কেবল নাকের সামনে আঙুলটা এমনভাবে বেঁকিয়ে ধরেন যে সেটা দেখেই হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায় | বড়বাবুর ঘরে কাতুকুতু থেরাপিতে জগন্নাথ আর শ্যামাচরণ দুজনেই ঠাণ্ডা | অপরাধ স্বীকার করতে বেশি দেরি হ'ল না আর | কিন্তু বোঝা গেল না, পুলিসকে হয়রানি করার পেছনের আসল কারণটা কী |

তিন

কিন্তু আসল কারণটা কী? না বলা পর্যন্ত কাতুকুতু থেরাপি চালাতে লাগলেন রিপুদমন | হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে আসছে ওই দুই ধড়িবাজের | এ এমন থেরাপি যাতে শরীরের

কোথাও কোন দাগ পড়বে না | না কালশিরা, না মারের দাগ | ছ্যাঁকা দেওয়া বা আঙুলে ছুঁচ ফুটানোর মতো আদিম অত্যাচারও নয়; ডাণ্ডার বাড়ি নয়, রুলের গুঁতোও নয় | মানবাধিকার কর্মীদের হাতে কোনও প্রমাণ তুলে দেওয়া নয় | থানার ভেতর থেকে ভেসে আসছে কেবল হাসির আওয়াজ | হাঃ হাঃ, ওরে বাবারে – হিহ্ হিহ্ | আর না রে, হোহ্ হোহ্ | আর পারি না, হেহ্ হেহ্ | লোকজনের একটা ভিড় জমে গেল | কিন্তু কারও কিছু বোধগম্য হচ্ছে না | কারণ বড়বাবুর ঘরের দরজা-জানালা সব ভেতর থেকে বন্ধ |

অবশেষে অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল দুই অপরাধী | দুজনেই দুজনের দীর্ঘদিনের বন্ধু | নানা কায়দায় নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই এদের কাজ | আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া, মিথ্যে মামলা করে অসহায় মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এদের বাঁ-হাতের খেল | এই অপরাধটা সে তুলনায় তুচ্ছ | মিথ্যে ফোন করে পুলিসকে হয়রানির জন্য আর কতটাই বা সাজা হতে পারে | উদ্দেশ্যটাও জানা গেল | বাগানে ডাঁই হয়ে জমে থাকা গাছের শুকনো ডাল চেলা করে টুকরো টুকরো করা আর বাগানের মাটি কোপানোর কাজটা পুলিসকে দিয়ে বিনা পয়সায় করিয়ে নিয়েছে এই দুজনে প্ল্যান করে | কত বড় বদমাশ! রাগে জ্বলছেন রিপুদমন | কিন্তু হাসিও পাচ্ছে |

স্বীকারোক্তি সই করিয়ে, দুজনকে কান ধরে ওঠবোস করিয়ে হাসতে হাসতেই ঘরের দরজা খুলে দিলেন রিপুদমন | ফিসফিস করে বললেন, - আর যদি কোন বাঁদরামির খবর পাই, শাস্তি কিন্তু প্রকাশ্যেই হবে | সাবধান! চারদিকে নজর রাখবেন | কোথাও বোমাটোমা জড়ো হলেই আমাকে খবর দিয়ে যাবেন | এটা আপনাদেরই দায় | নতুবা এলাকার যাবতীয় ক্রাইমের সমাধানে প্রথমে কিন্তু আপনাদের ওপরেই আমি থেরাপি চালাব |

•••••✹•••••

অন্তরে বাহিরে

হুসনে জাহান

একবার এক ছুটির দিনে কাঁচা বাজারে কেনাকাটা সেরে বাসায় ফেরার পথে নতুন এক উঁচু দালানে দোকানপাট খুলেছে দেখে কৌতূহলবশত ঢুকেছিলাম | আমি তখন দৈনন্দিন সাধারণ পোশাক পরিহিত | এক দোকানে ঝলমলে সুন্দর শাড়ী ঝোলানো দেখে এগিয়ে গেলাম | সামনের এক শাড়ীর দিকে ইশারা করে দোকানে দাঁড়ানো কর্মচারীকে দাম জিজ্ঞেস করলাম | সে আমার কথা না শোনবার ভান করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা দিল | তার ব্যবহার দেখে আমারও চড়ে গেল জিদ | কী ব্যাপার, দোকানের কর্মচারী ক্রেতাকে দোকানের কাপড়ের দাম বলতে কেন অনিচ্ছুক? সে কি আমার পরনে সাধারণ পোশাক দেখে এই ধরনের শাড়ী কেনবার অক্ষমতা বুঝে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে রাজি নয়? আমার মতো সাধারণ গ্রাহকের সাথে কথা বলতে অনিচ্ছা থাকলে দামটা শাড়ীর গায়ে তো অন্তত লাগিয়ে রাখা উচিত | উঁহু, না, তাহলে তো পণ্য নিয়ে দাম কষাকষি করা সম্ভব হবে না! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও নাছোড়বান্দা | গলার স্বর উঁচুতে চড়িয়ে বললাম, 'এই যে শুনুন, এ শাড়ীটার দাম কত?' নিরুপায় কর্মচারী নাছোড়বান্দা খদ্দেরের পাল্লায় পড়ে কি আর করে! অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপেক্ষার মুখভঙ্গি নিয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত গলায় জবাব দিল, 'পঁচিশ হাজার |' সে আজ থেকে অন্তত বছর ৩০ আগের ঘটনা | পঁচিশ হাজার টাকা দামের শাড়ী তো সেদিনে শুধু কিছু উঠতি ধনী পরিবারই কিনতে আগ্রহী হবে | আর যারা ধনী লোকের সাথে ওঠাবসা করতে আগ্রহী, তারা সমাজের উঁচুস্তরে মেলামেশার উদ্দেশ্যে নিজে না খেয়ে সামর্থের অধিক পয়সা খরচ করেও হয়তো এটা কিনতে চাইবে | মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় দিদিমা ও মায়ের কাছে শোনা এক প্রচলিত শ্লোক, "বাবু এক মরে ভাতে, আরেক মরে শীতে |"

লক্ষ্য করছি যে আমার বয়স উর্ধ্বমুখী হবার সাথে দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক অবস্থাও উর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে | তাই এটাও উপলব্ধ হয়েছে যে শুধু পার্টিতে বা কারো বাসায় বেড়াতে যাওয়া বা চাকরির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, দোকান বা হাটবাজারেও পোশাক আশাকের মান বুঝেই দোকানদাররাও তাদের মাল বার করে | অযথা কথার অপচয় করতে তাদের মোটে আগ্রহ নেই | দোকানে এবং রাস্তাঘাটে মানুষের বয়োবৃদ্ধি মনে করিয়ে দিতেও

লোকজন পিছপা হয় না | দোকানদাররা অল্প-বয়সীদের ম্যাডাম, আপা, দিদি সম্বোধন থেকে মাঝ-বয়সীদের খালা, মাসী, আর তার পরে দাদি, দিদিমা সম্বোধন করে আমাদের বয়স বুঝিয়ে দিতে মোটেই কসুর করে না | কাজেই নিজেকে কিভাবে জাহির করতে চাই সে সিদ্ধান্ত নিজেই বুঝেশুনে নিতে হয়|

আমেরিকার মতো উন্নত দেশে যেখানে অধিকাংশ মহিলাই দৈনন্দিন চলাফেরায় অত্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল পোশাক পরে থাকে, সেখানেও এক অভিনব অভিজ্ঞতা হ'ল আমার | ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে বিকেলে আমি বাসার আশেপাশে পায়চারি করতে যাই | এইরকম একদিন ইউরোপ থেকে আগত এক রিফিউজি মহিলার সাথে পরিচয় | কথা প্রসঙ্গে মহিলা আমাকে জানায় সে এক কারখানায় ভারী মেশিনে প্রশিক্ষণ নিয়ে সপ্তাহব্যাপী চাকরিতে নিয়োজিত | তবে তার মেকানিক স্বামী কোনও কাজে যোগ দেয়নি, কারণ সরকারের তরফ থেকে তাহলে তাদের বাসস্থান এবং বেকার ভাতার ব্যবস্থা নাকচ হয়ে যাবে | ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হ'ল না | তবে আমার তাতে মাথা ব্যথার কী দরকার? মহিলা মার্জিত ইংরেজিতে কথা বলে, আর ছুটির দিনে তার ছোট্ট সাদা কুকুর নিয়ে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণের সঙ্গী হয়|

এক ছুটির আগের সন্ধ্যায় সে জানাল যে আগামী ছুটির দিনে তারা এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত | তাই সে হাঁটতে আসবে না | তারপর গর্বিত স্বরে সে আমাকে তার মোবাইল ফোনে এক অভিজাত পোশাক এবং জুতোর ছবি দেখাল | সেই পোশাকটায় নাকি দু'মাস আগে ১০০ ডলার দামের লেবেল ছিল | তার এক মাস পর সে দেখেছিল সেই একই পোষাকে নাকি ৮০ ডলারের টিকিট ঝোলানো ছিল | তারপর এই সপ্তাহে সেই ড্রেসে ৪০ ডলারের লেবেল দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিনে নিয়েছে আগামীকাল পার্টিতে পরবার জন্য | তার সাথে ম্যাচিং একজোড়া জুতোও সে কিনে নিয়েছে | আমি অবাক হয়ে তার কাহিনী শুনছিলাম | তারপর সে নিজেই সেই ড্রেস সম্বন্ধে তার গোপন ফন্দিও বাহাদুরির সাথে ফাঁস করে দিল, 'জানো, আগামীকাল পার্টিতে এটা পরবার পর এই ড্রেসটা সুন্দর করে ইস্তিরি করে ও ভাঁজ করে জুতোসহ আবার দোকানে ফেরৎ দিয়ে আসব |' এবার সত্যিই আঁতকে উঠে আমার আকাশ থেকে ধরায় পড়ে যাবার অবস্থা! এ আবার বলে কি মহিলা? তা কেমন করে সম্ভব! সে মুচকি হেসে স্বাভাবিক সুরে বলল, 'ওহ হুসনা, শুধু আমি কেন, সবাই এমনই করে | আমি তো দুবার একই গ্রুপের পার্টিতে একই ড্রেস পরে যেতে পারি না |' তার কথা শুনে আমি একেবারে হতবাক | কোনো মার্জিত রুচির ভদ্রমহিলারা যে এরকম কান্ড করতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে | আর এদেশের এত কড়া আইন-শৃঙ্খলা নিয়ম-কানুন থাকা সত্ত্বেও এরকম কাজ কীভাবে বরদাস্ত করা হয়?

এদিকে আমি যদি কখনো সমুদ্র তীরে বা রাস্তার ধারে সুন্দর ফুল পাতা দেখে ছুঁয়ে দেখতে গেছি অমনি আমার ছোট ৫ বছরের নাতি হৈ হৈ করে শাসনের আঙুল উঠিয়ে বলে, 'দাদি, মা বলেছে কোনো গাছে মোটেই হাত লাগানো যাবে না!'

মহিলা আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে নির্বিকারে বলল, 'তুমি জানো না, এর আগেও নিশ্চয়ই অন্য আরো দুজন দুবার এই ড্রেসটা কিনে দুবার ফেরৎ দিয়ে এসেছে | তাতেই তো ওটা দুবার দোকান থেকে উধাও হয়ে আবার ফিরে এসে কম দামে তৃতীয় দফায় দোকানে ঝুলেছে | হা, হা, হা! এরকম তো সবাই করে এখানে | কাপড়চোপড় কিনে ব্যবহার করে এক মাসের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে কোনোই অসুবিধা হয় না |'

অনুন্নত দেশে যথেষ্ট পরিচয় না থাকলে দোকানদার তো কখনই ট্রায়াল দেবার জন্য কোনো পণ্য বাসায় নিয়ে যেতে দেবে না | হয়তো পূর্ব-পরিচিত গ্রাহকের অনুরোধে দোকানী সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় একদিনের ভেতর ফেরৎ দেবার অনুমতি দিতে পারে | কিন্তু এভাবে ভাঁজ ভেঙে ব্যবহার করবার পর পোশাক, জুতো বা প্রসাধন সামগ্রী ফেরৎ নিতে কোনো দোকানই রাজী হবে না – এক মাস তো দূরের কথা এক দিনের জন্যও নয় | সামাজিক প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি যখন প্রাধান্য পায়, তখন স্বভাবতই মানুষ এই ধরনের নানান নীতিবিরুদ্ধ ও অসামাজিক কাজের সুযোগ নিতে প্রলুব্ধ হয়|

এদেশের বাঙালি মহলে কারো কারো বেশী দাম দিয়ে বিশেষ ব্র্যান্ডের জামা, জুতো কেনবার ঝোঁক দেখা যায় | একবার এক কাপড়ের মেলায় কেনাকাটা করবার সময় ক্রেডিট কার্ডের টাকা শেষ হয়ে গেলে এক মহিলা স্বামীকে ফোন করে অনলাইন ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্টে অবিলম্বে টাকা পাঠিয়ে দিতে বলল | মহিলা স্বীকার করল যে নিজের কেনবার নেশা সে সামলাতে পারে না বলে তার স্বামী নাকি তাকে হুঁশিয়ার করে বলেছে, 'দেখো, আমি তো তোমার খরচপত্রে বাধা দিই না, কিন্তু মনে রেখো টাকা বাঁচলে তা তোমাদেরই প্রয়োজনে লাগবে | এবার

তুমি কিভাবে টাকা খরচ করতে চাও সে তোমাকেই বুঝে চলতে হবে।'

তবে এ কথাও অবশ্য মানতেই হবে যে একই শাড়ী একাধিকবার পরিচিত মহলে ব্যবহার করতে সবারই কিছুটা সংকোচ বোধ করা বা অপ্রস্তুত হওয়া স্বাভাবিক।

আজকাল কত বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালনের হিড়িক পড়েছে তার সাথে তাল রাখা আমার বয়সে কঠিন। আমাদের দেশের বারো মাসের তেরো উৎসব, যেমন দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, খ্রীষ্টের জন্মদিন, বসন্ত উৎসব, নববর্ষ, দুটো ঈদ, ইস্টার ইত্যাদি সবসময়ই পালন করা হত। তার সাথে আজকাল আবার যোগ হয়েছে ভ্যালেন্টাইনের দিন। বিদেশে আরো অনেক আছে – কালো শুক্রবার, বক্সিং ডে, ধন্যবাদের উৎসব, হ্যালোউইন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরো কত কী! প্রচুর বেচা-কেনার হিড়িক চলে হাটে-বাজারে। তবে আমার বয়সের এই সায়াহ্নে পৌঁছে বিনা প্রয়োজনে জিনিস কেনার প্রবৃত্তিতে অনেকটাই ভাঁটা পড়ে গেছে। কী হবে অযথা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আমার ছোট্ট ঘরটায় ঢুকিয়ে? শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তের জামা জুতো লেপ তোষক স্তূপ করে আমার নিজস্ব শোবার কামরায় ঠেসে ভরা। কোথাও যাবার প্রয়োজন হলে ওই স্তূপের ভেতর থেকে কাপড় খুঁজে বার করবার কথা চিন্তা করলে আমার বেরোবার আগ্রহ বেলুনের মতো চুপসে যায়। তার চেয়ে বাড়িতে বসে টিভি দেখা বা ফেসবুকে সবার মতামত দেখা অনেক বেশী আরামদায়ক।

সত্যি বলতে কি, কোনোদিনই অহেতুক বেশী দাম দিয়ে জিনিস কেনার প্রবণতা আমার হয়নি। ছোটবেলা থেকেই বাবা মায়ের সংসারে দাদা দাদু, চাচা ফুফু, ও তাদের সন্তানদের আমরা পরিবারের অংশ হিসাবেই দেখে এসেছি। নানা, নানু, খালা, মামা তারাও আমাদের বাসায় নির্বিবাদে পড়াশোনার জন্য, কেউ চাকরির পর আলাদা বাসা ভাড়া না নেওয়া পর্যন্ত অথবা চিকিৎসার কারণে আমার বাবা মা'র আশ্রয়ের উপরই নির্ভর করেছেন। সবার জন্য শহরে অবস্থিত আমাদের বাসাই ছিল উত্তম আশ্রয়স্থল। কাজেই আমাদের পরিবারে আমরা সবাই মিলেমিশে ভাগাভাগি করেই সবকিছু উপভোগ করে সংসারের নিয়ম কানুন বুঝে চলতে শিখেছি।

তারপর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের ভয়াবহ মহাযুদ্ধকালে আমরা কলকাতাবাসী। চালের দাম প্রতি মণ ২, ৪, ৫ টাকা থেকে বেড়ে ৪০ টাকায় পৌঁছানো দেখলাম। বাকি সব জিনিসেরও দাম আগুনের মতো বেড়ে গেল। চারিদিকে মহামারী, হাহাকার। প্রবৃত্তি না হলেও রেশনের মোটা চাল, লাল তুষভরা আটার রুটি ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছি। বাসার কাজের মেয়েরা ১০ টাকা দামের মিলে তৈরী রেশনের যেসব মোটা শাড়ি পরতে অপছন্দ করেছে, প্রয়োজনে পরিবারের মহিলাদের তখন সেসব কাপড় ব্যবহার করবার মানসিক প্রস্তুতি রাখতেও বাধ্য করেছে। অসহায় ভিখারিরা অযথা পয়সা বা ভাতের আশা করে গৃহকর্ত্রীকে অপ্রস্তুত করে নিজেরা নিরাশ হবে বুঝে 'এক মুঠো ভাত দাও মা'-র বদলে 'একটু ভাতের ফ্যান দেবে মা'-র বুলিতে পরিবর্তিত করতে শিখে নিয়েছিল।

আমাদের স্কুলে যাবার জন্য বরাদ্দ দু তিনটে ফ্রক আর এক জোড়া মোজা জুতো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, যদিও বেড়াতে যাবার জন্য আরো গোটা দুই পোশাক সযতনে তুলে রাখা থাকত। জামাকাপড় মোজা অল্পস্বল্প ছিঁড়লে যতদিন সম্ভব সেলাই করে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদার পয়সা চাইলে মায়ের মুখ মেঘে ছেয়ে যেত। কিন্তু নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করেও স্বামী ও সন্তানদের স্বাস্থ্য অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার সময়মতো পরিবেশন করতে মা কখনো ত্রুটি করেননি। কোনো কারণেই সেসব ব্যবস্থার কখনো নড়চড় হতে দেননি আমাদের মা জননী। কখনো কখনো মাসের শেষে বাবার বেতন প্রাপ্তির আগে কয়েকদিন হয়তো আলু বা অন্য কোনো ভর্তা, ডাল, ঘি আর ডিমভাজা খেয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সেদিনের মায়ের হাতের মমতা মাখানো আলুভর্তা, গরম ডাল, বিশুদ্ধ ঘি আর ডিমভাজার স্বাদ যেন এখনও মুখে লেগে আছে। আর অন্যদিকে সকলের মতো আমাদের মা মাসিরাও যুদ্ধের সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দলের কাছ থেকে উল এনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সোয়েটার, মোজা, টুপি ইত্যাদি তৈরী করতে তৎপর থাকতেন।

এই পরিবেশে বাস করে মিতব্যয়িতা তো আমাদের অস্থি মজ্জারই অঙ্গ হয়ে গেছে। বিয়ের পর স্বামী-শ্বশুরের সংসারে গিয়েও দেখেছি একই নিয়মের প্রচলন ছিল। তাঁরাও ছিলেন আমাদের পরিবারের মতোই আত্মীয়-বন্ধু পরায়ণ এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রচন্ড সংযমী। সেখানেও প্রয়োজনাতিরিক্ত

খরচ বর্জন করেই চলবার নিয়ম বলবৎ ছিল | কাজেই অপচয়, অহেতুক অর্থব্যয় করবার অভ্যাস কোনভাবেই আমাদের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেবার রাস্তা খুঁজে পায়নি | মোট কথা অধিক দামে ফেলাছড়া করে জিনিসপত্র কেনাকাটার অভ্যাস আমাদের কাছে অপরিচিত হয়েই থেকেছে | অতিরিক্ত দামে নতুনতম ফ্যাশনের পোশাক, নামী দামী ব্র্যান্ডের জিনিস কেনবার আগ্রহ আমাদের ঘুম কখনই নষ্ট করেনি | আমরা জেনেছি নিজের বাড়িতে সুস্বাদু খাবার রান্না করে যেমন যথেষ্ট তৃপ্তির সাথে খাওয়া সম্ভব, তেমনই অল্প খরচে লোকজনকে আপ্যায়ন করাও সম্ভব | তবে আজকের সদাব্যস্ত যান্ত্রিক যুগে সামাজিক প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এসব আদর্শবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না |

আমরা আজীবন ঈদ, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে পরিবারের এবং দু'একজন কাছের মানুষের থেকে কোনো উপহার পেলেই খুশি হয়ে যেতাম | প্রতি বছর এই কয়েকটি শুভদিন উপলক্ষ্যে যেসব পোশাক উপহার পেতাম তারপর অতিরিক্ত কিছু কেনার আর প্রয়োজন হতো না | নেহাৎ কোনো মেলায় হঠাৎ এক পছন্দসই পোশাক দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে সারা বছর আর অহেতুক পয়সা অপচয় করবার ইচ্ছে বা প্রয়োজন হয়নি | আসল ঘটনা তলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে সাজসজ্জা ও পরিধান সামগ্রীর ফ্যাশন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবসায়ীদের চাবিকাঠি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় | দেখা যায় একই ডিজাইন প্রতি ১০/১৫ বছর পর পর সামান্য রদবদল করে আবার বাজারে আসে | কিছু মডেল আর সিনেমার তারকাদের সাজিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই তো কিস্তিমাত! তখন দেখা যাবে আবার নতুন জিনিস কেনার হিড়িক আর ব্যবসায়ীদের বাজার গরম | তাই পুরনো দিনের পোশাক ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখলে আবার সেসব যখন নতুন হয়ে বাজারে আসবে তখন তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারা যাবে |

আজকের সমাজে সব পর্ব ও অনুষ্ঠানগুলো দেখে মনে হয় সবটাই যেন প্রতিযোগিতার স্তরে পৌঁছে গেছে | আমাদের সময় শিশুর জন্মের আগে সন্তানসম্ভবা মেয়ে যখন খাবার অরুচির প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠত, মায়েরা তখন স্নেহভরে মেয়ের খাবার শখ মেটাবার জন্য একদিন এক ঘরোয়া আয়োজন করে মেয়ের পছন্দের সব খাবার তৈরী করে তাকে খাওয়াত | আর এখন, সাধ তো আছেই এছাড়া জন্মদিন, গ্র্যাজুয়েশন, বিয়ের আগে সঙ্গীত, মেহেন্দি ইত্যাদি সবই এক বিশাল পার্টির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে |

পুরোনো দিনে আমাদের দেশে আজকের মতো প্রতি এলাকায় নামি দামী চাকচিক্যময় বিবাহের হল ছিল না | নিজের বাসা এবং পার্শ্ববর্তী সহৃদয় প্রতিবেশীর ঘর অথবা উঠোনে চাঁদোয়া বানিয়ে, সানাই, ঢোল বাজিয়ে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শীসহ বিবাহ সম্পন্ন হত | আংটি পরানো, হলুদের অনুষ্ঠান, যার যার আত্মীয়দের মাঝেই সারা হত | তারপর একদিন মোটামুটি জাঁকজমক করে বিবাহ এবং পরবর্তীতে বরের বাড়িতে গিয়ে বৌভাত সবই নিজেদের ও প্রতিবেশীর আঙিনাতেই সমাধা হত | আর আজকাল আমাদের দেশে দেখা যায় প্রতি বিবাহের অনুষ্ঠান পাকা দেখা বা আশীর্বাদ করা বা আংটি পরানোর অনুষ্ঠান দিয়ে থেকে শুরু করে দু পক্ষের আলাদা দুদিন হলুদের অনুষ্ঠান, তারপর বিবাহ, তারপর বরের বাড়ির পার্টি সবই যেন রাজকীয়ভাবে করাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে | তারপর প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য কনেসহ দু'পক্ষেরই মহিলারা বিউটি পার্লারে গিয়ে চুলের বাহারি সাজসজ্জা করে, সারা শরীর চুনকাম করে সাদা চীনামাটির পুতুলের মতো তৈরী করা সবার এক বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে | এক বিয়েতে ধবধবে সাদা এক বিদেশী কনেকে এভাবে প্রাণহীন সাদা পুতুলের মতো মঞ্চে বসানো দেখে আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেল | পরদিন বরপক্ষের বাসায় গিয়ে সেই মেয়েকেই তার স্বাভাবিক চেহারা ও কাপড়চোপড়ে দেখে অনেকটা স্বস্তি পেলাম |

এ রকম অনুষ্ঠানের আজকাল এমনই প্রচলন হয়েছে যে যেসব পরিবারের এমন ধরনের খরচ করবার সামর্থ নেই, তারাও সমাজে মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে যেমন করেই হোক এভাবেই সব অনুষ্ঠান পালন করবার জন্য বাধ্য হচ্ছে | মানুষের জীবনের সুখ কি ধন-দৌলতের পরিমানের উপর নির্ভর করে? তাহলে মানুষের আসল মূল্যবোধ কোথায়?

আমি আমেরিকায় এসে প্রথম দিন থেকেই প্রতি পদে টাকা এবং ডলারের বিনিময়ী হিসাব করেই চলেছি | সে ভূত আজ পর্যন্তও আমার মাথা থেকে নামেনি | এখানকার বাঙালি সমাজে সবাইকে যেভাবে অতি সহজে জিনিসপত্রের দাম নির্বিবাদে ডলারের বদলে টাকার অঙ্কে উল্লেখ করতে দেখি, আমি তা এখনো মেনে নিতে পারিনি | আর সেটা কীভাবেই বা সম্ভব? আমাদের দেশে এক ডলারের দাম যে এখনও ৮৫ টাকার উর্ধ্বে | সেখানে কারো

কাছে যদি এক লক্ষ টাকা থাকে সে হয়ে যায় লাখপতি, আর এক কোটি টাকা হলে হয় কোটিপতি | কিন্তু ডলারে সেই লক্ষ ও কোটির মূল্য যে অন্যরকম!

বছর দুই আগে ঢাকায় দাঁতের আর চোখের চিকিৎসার জন্য আমার ডাক্তারদের কাছে গিয়েছিলাম | দাঁতের ডাক্তারের ক্লিনিকে অনেক প্রবাসী বাঙালির সাথে দেখা | তারাও আমার মতোই মাতৃভূমিতে আত্মীয় পরিজনের সাথে দেখা করবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের তদারকির ফাঁকে এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলোরও সমাধান করবার চেষ্টায় থাকে | আমার দেশে যে দামে আমি ওসব কাজ করতে পারি, আমেরিকায় সেটা চিন্তার অতীত |

এদেশে দেশের মতো কাজের লোকের সাহায্য ছাড়াই পড়াশোনা, চাকরি, বাজার করা, রান্না, ঘরসংসার, ছেলেমেয়েদের স্কুল এবং আরো নানারকম কিছু সামলে এদের যখন সপ্তাহান্তে সেজেগুজে পার্টিতে যেতে কিংবা পার্টির ব্যবস্থা করতে দেখি, তখন এদের কর্মক্ষমতা এবং উৎসাহের প্রশংসা না করে উপায় থাকে না | অথচ এরকম মরিয়া হয়ে জীবন কাটানো সত্ত্বেও তারা এখানেই থাকতে চায় | এখানকার মানুষের সদা ব্যস্ততা দেখে আমি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছি, 'তোমরা কেন দেশের সুযোগ সুবিধা, বাবা মা, ভাইবোন সব ছেড়ে এদেশেই থাকতে চাও?' তাদের উত্তরগুলো মোটামুটি একই ধরনের – ছেলেমেয়েদের ভাল শিক্ষা, ভাল উপার্জন, যা দিয়ে দেশের আত্মীয় পরিজনকে সাহায্য করা যায়, এদেশের পরিবেশে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করা, এখানকার স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত খাওয়া ও চিকিৎসা ইত্যাদি | পরিবারের সব সন্তানই যদি বিদেশের মোহে দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন আমার মতো একাকী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার ভিটেমাটি থেকে ছিন্ন হয়ে সন্তানের আশ্রয়ে চলে আসা ছাড়া আর কী উপায় থাকে!

.....✷.....

রোজগার

অলোক কুমার চক্রবর্তী

আকাশে লটকে থাকা পাণ্ডুর ক্ষয়াটে চাঁদটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কানাইলালের বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে মাঝরাতের এই নিঝুম মায়াবী আলো আঁধারিতে হারিয়ে গেল | বিড়িটা ধরিয়ে নিজের চুলের মধ্যে দিয়ে একবার আঙুল চালায় কানাইলাল, ভাবে – সত্যিই কি এটা ওর পরীক্ষা, নাকি গণেশের? কে জানে? যদিও এসময়ে তার চিন্তাভাবনা, ভবিষ্যৎ – সবটুকু জুড়েই রয়েছে গণেশ, তবু এখন গণেশের নামটা মনে আসায় সে নিজের প্রতিই যেন একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল |

বছর পাঁচেক আগে এক সাদামাটা সকালে কানাইলাল এবং তার সহকর্মীরা হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো না হলেও, খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা বিমূঢ়তার সঙ্গে আবিষ্কার করেছিল তাদের রুটিরুজির ভরসাস্থল 'জগদ্ধাত্রী স্পিনিং মিল'-এ ক্লোজারের তালা | তারই মাস-চারেক বাদে সংসারে এসেছে কানাইলাল – শিউলির তৃতীয় সন্তান, যার প্রথম অঙ্কুরিত হবার খবরটা বেশ সহজ আনন্দের সঙ্গে নিয়েছিল কানাইলাল | কিন্তু ক্লোজারের কোপে হঠাৎ বেরোজগেরে হয়ে পড়ার পরই সংসারের আসন্ন পরিবর্ধনটাকে রুখতে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করেছিল শিউলির প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও – লাভ হয়নি কিছুই | কারণ তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক | আর, যেন তার এই দৌড়ঝাঁপ, দুরবস্থাকে বিদ্রূপ করতেই এক কিম্ভূত আকৃতি নিয়ে জন্ম নিল গণেশ, দুই হাত ছাড়াও দুই কাঁধের পাশ দিয়ে দুটি হাড়, ঠিক যেন আরও দুটি হাত, খানিকটা উঠে বেঁকে গেছে | মুখটাও কদাকার – নাক এবং তার নীচের অংশ ঠোঁট থুতনিসহ বেশ কিছুটা লম্বাটে হয়ে নীচের দিকে ঝুলে রয়েছে | পেটের অংশটা দুমড়ে দলা পাকিয়ে সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়েছে যেন |

পাড়ার সর্বজনীন পিসি হরিমতি ঠাকরুনই প্রথম বলে উঠেছিলেন – "ওমা, এ যে সাক্ষাৎ গণেশ ঠাকুরটি গো! জয়বাবা সিদ্ধিদাতা..." সেই থেকে ও গণেশ | তবে সিদ্ধিদাতা! হুঁ! শিউলির জীবন সংশয় হয়ে পড়েছিল ওর জন্মকালে | যে সামান্য জমানো পুঁজিটুকু পাথেয় ছিল সামনের রোজগারহীন অনন্ত

দিনগুলোর সমুদ্রে সংসারের নৌকোটাকে বেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তার সবটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে শিউলিকে বাঁচাতে গিয়ে। নিজের এই অভাবনীয় বিপদের ধাক্কায় বিধ্বস্ত কানাইলালের শুধু নিষ্ফল রাগে গজরানো ছাড়া আর কীই বা করার আছে? চারিদিকে নানা বিদ্রূপ, শুধু হরিমতিপিসির মতো কিছু মানুষ আজও মাঝে মধ্যেই প্রণামী দিয়ে যান দু'পাঁচ টাকা। কানাইলালের গজরানি ঠাণ্ডা করতেই শিউলি বলে মাঝে মাঝে – "নিজের সন্তান সম্পর্কে কুচিন্তা মনে এনেছিলে বলেই ভগবানের এই শাস্তি।"

কানাইলাল শুধু রাগে হাত কামড়েছে – আজীবন তাকে এই বোঝা টেনে যেতে হবে ভেবে। তার সমস্ত রাগ, গজরানি, অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করে, সকাল থেকে রাত অবধি নানা ধান্দায় থেকে রক্ত জল করে রোজগার করা তারই অন্নে দিন দিন বড় হয়ে উঠেছে গণেশ, তারই চোখের সামনে। ঘাড় শক্ত করে মাথা তুলতে পারে না, নীচের দিকে ঝুলে থাকে। লম্বাটে মুখ থেকে শুধু লালা গড়িয়ে যায়, আর গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ বার হয় গণেশের গলা দিয়ে – যেন তার এই অবস্থার জন্য কানাইলালকে সে দায়ী করে যায়।

গণেশের প্রতি অফুরন্ত মমতা শুধু শিউলির। দু'চোখে তার জলের ধারা বয়ে যায় অঝোরে। সমস্যা আর সংস্কারে জর্জরিত, গন্ডিবদ্ধ তার অপরিসর মনে শুধুই ঘুরপাক খায় – কানাইলাল তাকে পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে চায়নি বলেই ও এই চেহারায় জন্ম নিয়েছে।

উদয়াস্ত রোজগারের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে কানাইলাল। প্রায়ই খালি হাতে ফিরতে হয়। ফলে আধপেটা খাওয়া। বড় ছেলেটাকে প্রাইমারি স্কুলের পড়া ছাড়িয়ে সম্প্রতি পেট-খোরাকিতে কাজে লাগিয়েছে স্টেশন পাড়ার বিশুর চায়ের দোকানে। মর্যাদায়, মানসিকতায় নিজের পুরনো জায়গা থেকে অনেক নেমে এসেছে কানাইলাল। ক'টা পয়সার জন্য আজ আর কোনো কাজই তার কাছে আটকায় না। তবু, রোজগার কই?

এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা ওর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় দুলাল সামন্তর সঙ্গে। বহুদিন কলকাতায় কাটিয়ে মাত্র মাসখানেক আগের এক বিকেলে গাঁয়ে পা রেখেছে দুলাল সামন্ত। ধুরন্ধর করিৎকর্মা লোক। সঠিক কী করে জানা যায় না, তবে জানে বোঝে অনেক কিছু, পয়সাও করেছে বেশ। ক'দিন আগে আবার দেখা হতে কানাইলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার বাড়ির দাওয়ায় এসে বসেছিল দুলাল – শিউলির তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেওয়া মোড়ায়। একথা সেকথার পর আসে গণেশ প্রসঙ্গ। ও তখন বারান্দার এক কোণে বসে শুধু গলা দিয়ে একটানা ঘড় ঘড় আওয়াজ করে চলেছিল। বারান্দার এপারে কথা গড়িয়ে চলে।
দুলাল সামন্ত বলে সুহৃদের গলায়, "আমার কথা যদি মানো, কানাই, তুমি লিখে নাও – ওই ছেলেই রোজগার করে তোমায় খাওয়াবে। শুধু তোমার মন শক্ত আর খোলা রাখতে হবে।"

দ্বিধা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে থাকে কানাই। এতক্ষণ ধরে বলে যাওয়া সামন্তদার কথাগুলো তার মাথায় যেন জড়াপটি পাকিয়ে যায়। শুধু শিউলি বলে হতাশ ক্ষোভে – "এই অবোধ ছেলেটাকেও শেষে রোজগার করতে নামাবে?"
- "সে কথা নয়, বৌমা" – বোঝায় দুলাল, "আসলে সংসারে কেউই ফেলনা নয়। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার থাকে সংসারে। শুধু ঠিক রাস্তায় সেটাকে চালানো। তোমার ওই ছেলেই বা বোঝা হয়ে থাকবে কেন? চলো কলকাতায়, আমার পরামর্শে কাজ করো – তোমাদের ভাবনা বদলে যাবে।"
উঠে দাঁড়ায় দুলাল – "আমি কাল সকালে কলকাতায় গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরব ইউসুফ আর পল্টুকে নিয়ে, কথাবার্তা পুরো হয়ে যাবে।"

তাই হয়েছে। ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারটাও পাকা হয়েছে। ইউসুফ আর পল্টু সব ব্যবস্থা করবে। কিছুটা ভাগ থাকবে সামন্তরও। তাছাড়া এলাকার ওস্তাদকে, পুলিশকেও কিছু দিতে হবে – অল্পই। একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে কানাইলালের। দুদিন হ'ল ওরা ফিরে গেছে কলকাতায়। বড়ছেলে মানিককে এখানে রেখে আগামীকাল ভোরেই শিউলি, গণেশ আর মেয়ে বুলুকে নিয়ে কানাই চলে যাবে কলকাতায় এন্টালিতে। সেখানে ইউসুফ, পল্টুরা ওদের থাকার জায়গা ঠিক করে রেখেছে। বাকি রাতটুকু একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য কানাই ঘরে ঢুকল।

এতটা কানাইলাল নিজেও ভাবতে পারেনি। এন্টালির বস্তিতে কাল সন্ধ্যায়ই পল্টু জনাচারেক লোকের হাতে দশটা করে টাকা ধরিয়ে দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়েছিল। আজ সকালে কাকভোরে গণেশকে একটা নতুন গোলাপি চেলি পরিয়ে ওরা মল্লিকঘাট ফুলবাজারের পাশে গঙ্গার ঘাটে একটা নতুন গামছা পেতে বসিয়ে দিল। স্নানার্থীরা তখন সদ্য আসতে শুরু করেছে।

একটু লোকসমাগম হতেই গতকাল সন্ধ্যার সেই চারজনের দুজন কাছে এসে বেশ সরবে চারিদিকের সকলকে জানান দিল – "জয় জয় গণপতি শ্রী সিদ্ধি বিনায়কবাবা কী" রবে। তারপরই হাঁটুমুড়ে বসে জোড়হাতে শুরু করল "শ্রীশ্রী গণেশবন্দনা"। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল নানাদেশী পুণ্যার্থীর। হতভম্বের মতো কানাইলাল শুধু দেখতে লাগল পরিষ্কার, ময়লা, ভেজা, কাদালাগা নানারকম টাকা-পয়সায় গণেশের সামনে পাতা গামছাটা ঢেকে যাচ্ছে। একবার শিউলির দিকে তাকিয়ে দেখল – ওর মুখটা একটু ওপর দিকে তোলা, দু'চোখ বেয়ে শুধু বয়ে চলেছে জলের ধারা।

একটু বেলা বাড়লে, স্নানার্থী যখন কমে এসেছে, আড়াল থেকে পল্টু, দুলাল সামন্ত আর সেই দুটি লোক বার হয়ে এসে ইশারা করতে শিউলি গণেশকে কোলে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর ওদের সজাগ দৃষ্টির পাহারায় জমা টাকাপয়সাগুলো একটা কাপড়ের থলিতে ঢেলে নিয়ে পায়ে পায়ে পিছু নিল কানাইলাল। ঘাট থেকে উঠে এসে বড়রাস্তা পেরিয়ে গলিঘুঁজি দিয়ে এসে একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে এসে ঢুকল। বিস্ময়ে হতবাক কানাইলাল যান্ত্রিকভাবে দেখে যায় ওদের টাকাপয়সার ভাগাভাগি। এই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এতকাল ওর বোঝা হয়ে থাকা গণেশের রোজগার মোট বারো'শ ছাপ্পান্ন টাকা!

টানা রিকশায় চেপে ওরা এবার এল শেয়ালদা স্টেশনে। এখানে দাঁড়িয়ে ছিল ইউসুফ। ওর কথায় – "এবার গণেশের সেকেন্ড শিফ্ট।"

এখানে দেখা গেল স্টেশন চত্বরে বেশ মাঝামাঝি একটা জায়গা ইউসুফ আগেভাগেই দখল করে রেখেছে। গণেশকে বসানোর পর সে গোটা কয়েক ছবি আঁকা ও "শ্রীশ্রী গণেশ বন্দনা" লেখা পোস্টার পেতে সেগুলোর কোণায় কোণায় ইঁটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল। হাজার ব্যস্ততায় ছুটতে থাকা মানুষ ওই দৌড়ের মধ্যেই থমকে দাঁড়ায়, ক্ষণিক বিস্ময়ে কৌতূহল মিটিয়েই পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা পেল ছুঁড়ে দিয়ে একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার দৌড়, তার মধ্যেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। কেউ কেউ আবার অলসভাবে বসেই থাকে গালে হাত দিয়ে – সংশয়বাদী বা অলৌকিকতা প্রত্যাশী – অদ্ভুত জিনিস! কানাইলাল নিজেও কখনো এত কৌতূহল নিয়ে গণেশকে লক্ষ্য করেনি তো!

এত চড়া রোদের মধ্যে বসে থাকা গণেশের অভ্যাস নেই। ওর কপাল, গাল-গলা ভরে যায় ঘামে, গলার গোঙানির আওয়াজটা যায় বেড়ে। শিউলি বুঝতে পারে। ধরা গলায় কানাইলালের উদ্দেশ্যে বলে, "ওর খিদে পেয়েছে। গরমও লাগছে। এবার শেষ করো।" – আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে যায় গণেশের ঘাম। চাপা গলায় হুঁশিয়ারি দেয় ইউসুফ – "খবরদার, আভি কুছ নহী করনা।"

পাশ থেকে পল্টু বলে, "আরে এটাই তো সময়। এই কষ্টটা দেখলেই তো পাবলিকের মায়া, করুণা আরও বাড়বে। পয়সাও আসবে আারো। এটা মাটি করে কেউ?" থমকে থেমে যায় শিউলি।

কানাইলাল গণেশের সামনে জমেওঠা টাকাপয়সার দিকে তাকিয়ে ভাবে গণেশ তো তারই সৃষ্ট সম্পত্তি! গণেশের তো মস্তিষ্ক বা নিজস্বতা কিছুই নেই। সে আজ তার গণেশকে এভাবে ব্যবহার করছে বলেই তো এই পয়সা আসছে! তার মনে পড়ল না গত সাড়ে চার বছর ধরে গণেশের প্রতি তার বিরূপতার কথা। মনে পড়ল না যে, জন্ম থেকেই গণেশকে সে মনে করে এসেছে এক অপরিত্যাজ্য বোঝা। আত্মতুষ্টিতে বুঁদ কানাইলালের চোখে পড়ল না যে শিউলি তার এই অবোধ, নির্বল সন্তানটিকে ওর নিজের অজান্তে তাদের ডুবতে বসা সংসারের অর্থনৈতিক পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কানাইলালের আজ অনেক গর্ব – তার গণেশকে দিয়ে রোজগার হচ্ছে। ইউসুফ বলেছে, সামনের মরসুম থেকে গণেশ বছরে চার মাস করে সার্কাস দলের সঙ্গে থাকবে। ভাগ্যিস গণেশ এমন বিদঘুটে আকৃতি নিয়ে জন্মেছিল!

হঠাৎ একটা শোরগোলে চমক ভাঙে কানাইলালের। "আউ-আউ-আউ-আউ" জাতীয় একটা চিৎকার শুধু কানে আসে ওর। আসলে কাজে যাওয়ার পথে অন্যদের মতোই ভিড় দেখে কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বোবা একটি ছেলে – বছর সতেরো-আঠারো বয়স – কেষ্ট ওর নাম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সবার এই মজা দেখা ও পেছনের আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করেই আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। বোবা হওয়ার জন্মগত ঘাটতিতে ও কথা বলতে পারা মানুষদের চেয়ে কিছুটা পিছিয়েই আছে। চারপাশের সকলেই প্রতিনিয়ত নানা আচরণে, বিদ্রূপে তাকে তাই জানিয়ে দেয়। আর আজ একজন জন্ম-অসহায়কে শাস্তি দিয়ে এরা শুরু করেছে রোজগার করা!

আগুপিছু না ভেবেই কেষ্ট ঝাঁপিয়ে পড়ে গণেশকে তুলে নিতে যায়| ইউসুফের কড়া হাতের দুটো থাপ্পড় আর ঘাড়ধাক্কা খেয়েও দমে না সে| কী এক নিজস্ব ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে গণেশের অসহায়তার সমব্যথী কেষ্ট – আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় তার চারপাশের সকলকে এটা বোঝানোর জন্য – শব্দ বার হয় শুধু "আউ-আউ-আউ-আউ"|

আর চারপাশের কথা বলতে পারা মানুষগুলো একইরকমভাবে ছুটতে ছুটতে ক্ষণিক থেমে, নির্বাক একটু মজা দেখার অনুভূতি নিয়ে যথারীতি গণেশের দিকে ক'টা পয়সা আর এক টুকরো প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে আবার ছোটে নিজেদের ধান্দায়| আর যার জন্য এত কাণ্ড, সেই গণেশ প্রচণ্ড রোদে তেতে ঘেমে শুধু একটানা গোঁ গোঁ গোঙানির আওয়াজ করে যায়| ভ্রূক্ষেপহীন ঝুলে থাকা মুখ দিয়ে লালা ঝরে অবিরাম | বোঝা যায় না তার এই অসহায়তার পসরা সাজিয়ে জমে ওঠা রোজগারে সে খুশি না অখুশি|

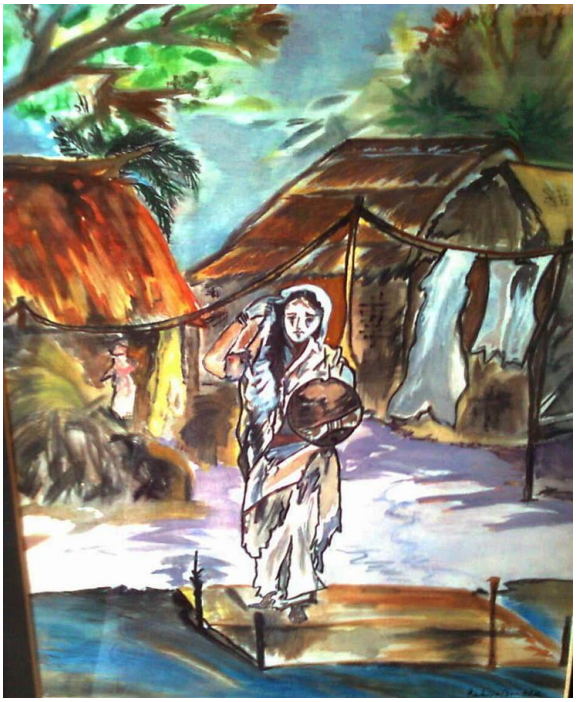

•••••✷•••••

একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রেমকাহিনী

ডলি ব্যানার্জী

হিমালয়ের কোলে কুইন অফ দার্জিলিংয়ের ছোট্ট শহর 'ঘুম' | ঘুম নামটি কোনও এক অজানা রহস্যে ভরপুর | মন ভোলানো তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য | রূপোর মুকুটে উজ্জ্বল কাঞ্চনজংঘা, তুষার ধবল মাউন্ট এভারেস্ট থেকে কত নাম না জানা শৃঙ্গ নিয়ে হিমালয়ের এই ছোট্ট শহর, দার্জিলিংয়ের থেকেও এর উচ্চতা বেশী| এখন বসন্ত বাতাসে ঘুম যেন সুপ্তোত্থিত| আলস্য ভেঙে রূপের ছটায় ভরপুর | রডোডেনড্রন, ক্যামেলিয়া আর অসংখ্য নাম না জানা পাহাড়ী ফুল ছড়িয়ে আছে ঘুমের পথে প্রান্তরে | 'ঘুম বৌদ্ধ আশ্রম' আর দার্জিলিংয়ের 'ধীরধাম' আমার খুব প্রিয় জায়গা | সান্ধ্যসমীরণে দার্জিলিং যখন দীপমালায় সজ্জিত তখন হিমেল বাতাসে ভেসে আসা ধীরধামের ঘন্টাধ্বনি আমাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করত | আর আমরা যেতাম সেন্ট জোসেফ'স-এর বন্ধু লাকপাডোমার সঙ্গে টয় ট্রেনে করে ঘুম বৌদ্ধ আশ্রমে | সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মন্ত্রপাঠ, ধূপের গন্ধ, আশ্রমের আবহাওয়া আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিত | সেখানে 'তামাংলামা' নামে একজন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ছিলেন; রূপে-গুণে আলো করা এক যুবক – সকলের প্রিয় | বৌদ্ধ-ধর্মে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য | আমরা মুগ্ধ শ্রোতার মতো ওঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতাম | আমার কিশোরী মনে প্রবল জিজ্ঞাসা ছিল যে ভরপুর তারুণ্যে প্রাণবন্ত এই যুবক কী করে সংসারের মায়াবন্ধন ত্যাগ করে বুদ্ধের সেবায় আত্মোৎসর্গ করলেন? লাকপাডোমা ভুটিয়া আকর্ষিত হ'ল তাঁর পানে|

"প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও দাও দাও দাও
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না
পাল তুলে দাও দাও দাও দাও|"

দোঁহার প্রেমের জোয়ারে ১৮ই জানুয়ারী – ভুলব না কোনদিনও | কী এক অভিশাপে আকাশ মাটি কাঁপিয়ে তমসাচ্ছন্ন বারিধারায় ভেসে গেলে | মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে পাড়ি দিলে অশ্রুনদীর সুদূর পারে | জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাঁচার লড়াই করলে সারাক্ষণ | তাকাও প্রিয়জনের মুখের পানে | বাঁচাতে পারিনি আমি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় – অপরাধী মন আমার| তুমি ছিলে উদার প্রাণবন্ত | সততার জাজ্জ্বল্য নিদর্শন | জীবনের জটিলতা,

সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে তোমার আসন | তুমি ছিলে দেশপ্রেমী, "ধনধান্যপুষ্পভরা" ছিল তোমার প্রিয় গান |
আরব সাগরের কূলে বসে অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে | বিদেশের মাটিতে করতে দেশের গান, নিজ দেশের আরাধনা |
সেই নিজ দেশে ফেরা হ'ল না তোমার | এক নিষ্ঠুর নিয়তি ছিঁড়ে ফেলে দিল স্বপ্ন দিয়ে বোনা জাল |
আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে একান্ত নিরালায় বসে ভাবি | আমি যে তোমায় ভালবেসেছিলাম সারা জীবনের সাথী মনে করে | অভিমান করে কেন তবে চলে গেলে দূরে?
সান্ত্বনা খুঁজে ফিরি | যাদের জন্য তোমার ভাবনা তাদের রেখে গেলে সযতনে | নিজের সন্তানকে দিয়ে গেলে অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করার ভার – মায়ের ভার বহন করার দায়িত্ব |

•••••✹•••••

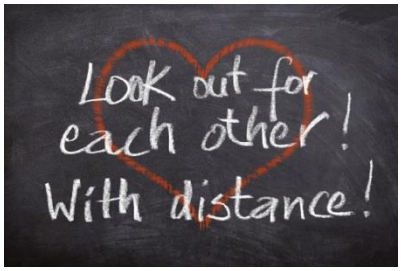

অনেক মানুষ করোনা ভাইরাসের এই বিপদজনক অবস্থায় জীবনের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজন করেছেন | ডাক্তার, নার্স, যাঁরা প্রতিদিন দোকান থেকে জিনিসপত্র তুলে খরিদ্দারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন, পুলিশ, দমকলবাহিনী এবং বহু স্বেচ্ছাসেবক, যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রতিদানের আশা না রেখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, – বিশ্বের সেইসব মানুষদের জন্য আমাদের 'পাঠচক্র'-র সকল বন্ধুদের পক্ষ থেকে সহৃদয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই |

(সব ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৭ (2020)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ নববর্ষ